কিশোর চিলার

টেরির দানো

রকিব হাসান

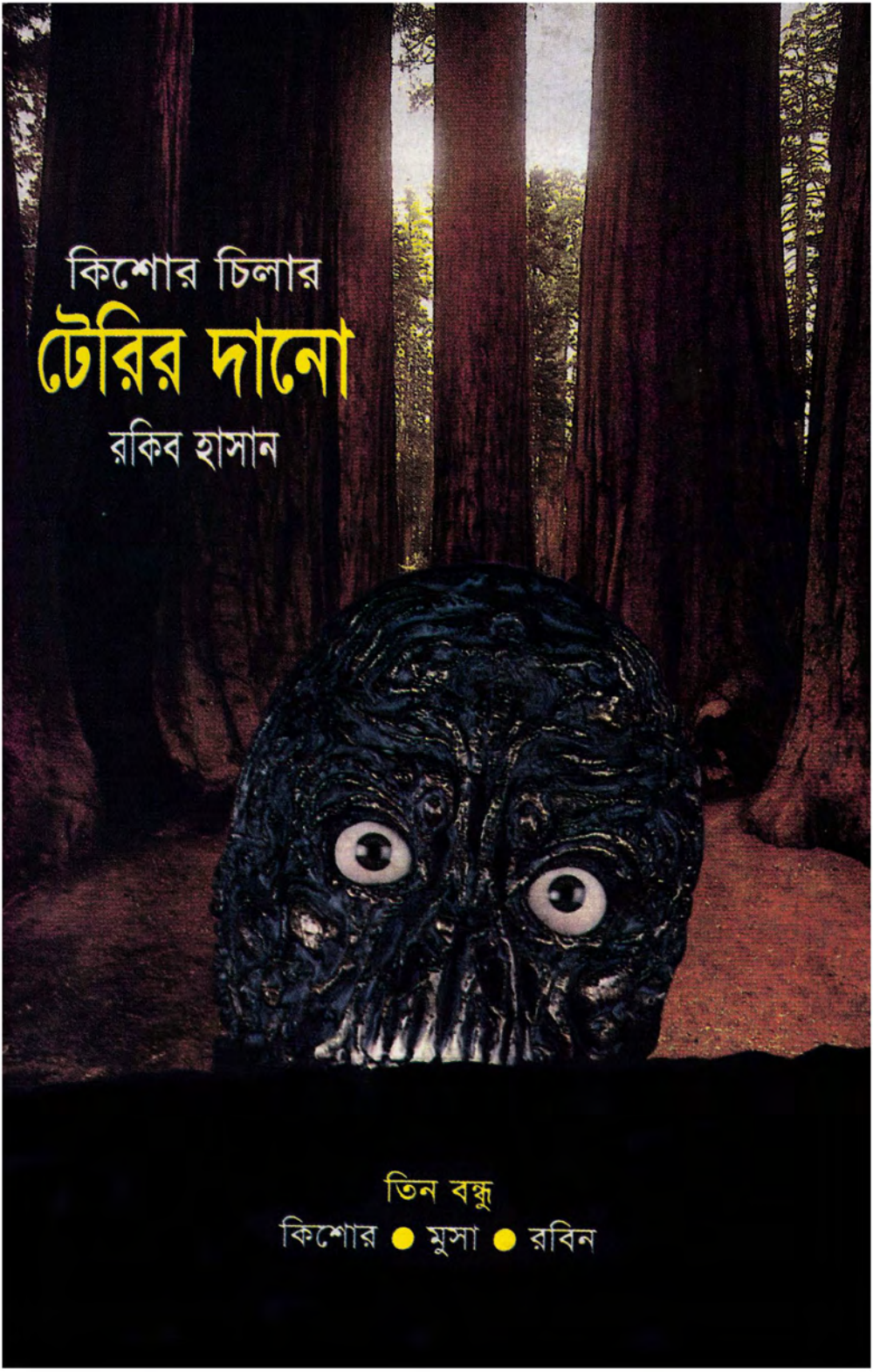

তিন বন্ধু

কিশোর ● মুসা ● রবিন

তিন বন্ধু
কিশোর চিলার

টেরির দানো

রকিব হাসান

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ
২০০১
প্রচ্ছদ
টিপু কিবরিয়া
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১ ৪১৮৪
E-mail Projapoti@ssl-idt.net
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

TERRIR DANO
By: Rakib Hassan
ISBN 984-462-292-1
মূল্য ॥ আটত্রিশ টাকা

পরিচয়

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা–
'তিন বন্ধু'র তরফ থেকে তোমাদের স্বাগতম।
আমি কিশোর পাশা বলছি।
নতুন যারা, আমাদের পরিচয় জানো না,
তাদের জানাই, আমি বাঙালী।
আমার এক বন্ধু মুসা আমান, আমেরিকান নিগ্রো।
অন্যজন রবিন মিলফোর্ড, আইরিশ আমেরিকান।
'তিন গোয়েন্দা' হিসেবে আমরা পরিচিত।
আমাদের মূল ঘাঁটি আমেরিকার রকি বীচে।
রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারের খাতিরে যে কোন জায়গা,
যে কোন শহর, যে কোন সময়ে, এমনকি যে কোন গ্রহেও
চলে যেতে পারি আমরা।
পুরানো পাঠকরা, দয়া করে 'চিলার'-এর সঙ্গে
'থ্রিলার'-কে গুলিয়ে ফেলো না।
এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সিরিজ। এ বইয়ে মনে হবে
অনেক কিছুই উদ্ভট, অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত।
কিন্তু কি প্রয়োজন চুলচেরা বাস্তব বিশ্লেষণের;
মজা পাওয়াটাই আসল কথা, তাই না?

প্রজাপতি প্রকাশন থেকে
তিন বন্ধু সিরিজের আরও ক'টি বই:

আমি রবিন বলছি, গরমের ছুটি, নেতা নির্বাচন, উড়োচিঠি, মোমের পুতুল, রহস্যের খোঁজে, হারজিত, পাগলের গুপ্তধন, ভিনদেশী রাজকুমার, বিড়ালের অপরাধ, ভোরের পিশাচ, অভিশপ্ত লকেট, কবরের প্রহরী, পেঁচার ডাক, ভয়াল দানব, টক্কর, এখানেও ঝামেলা, নতুন স্যার, মাছির সার্কাস, শুঁটকি বাহিনী, চাঁদের অসুখ, ড্রাকুলার রক্ত, আবার ঝামেলা, মাছেরা সাবধান, বড়দিনের ছুটি।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

কালটু মুসাটাকে আবারও ভয় দেখানোর সিদ্ধান্তটা যেদিন নিলাম আমরা, সেদিন ছিল আমাদের ক্লাসের মাঠ পর্যায়ে গবেষণার দিন। কালটু বলি কেন তাকে জানো? গায়ের রঙ কালো বলে।

মিস্টার হোমার, মিসেস ডকট্রিন ও আমাদের ক্লাসের আরও কয়েকজন টীচার গুনে গুনে দেখছেন হলুদ স্কুল বাসটায় ঠিকমত চড়ছি কিনা আমরা।

সারির মাথায় প্রথমেই রয়েছে কিশোর পাশা। সব কিছুতেই আগে আগে থাকা চাই তার। পেছনে তার দুই চামচা মুসা আর রবিন।

দিনটা ধূসর। আকাশে ভেসে বেড়ানো কালো মেঘ সূর্য ঢেকে দিয়েছে। রেডিওতে আবহাওয়ার সংবাদে বলেছে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ।

ওসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। স্কুলে ঘরের মধ্যে যে বসে থাকতে হয়নি এতেই খুশি।

সারিতে আমার সামনে রয়েছে আমার বন্ধু ক্যাপ। দুষ্টুমি করে তাকে ধাক্কা দিয়ে তার সামনের ছেলেটার ওপর ফেলে দিলাম। ক্যাপ-এর আসল নাম এরিক, কিন্তু সবাই ডাকে 'ক্যাপ'। কারণ সব সময় তার মাথায় থাকে একটা বেজবল ক্যাপ। ওই ক্যাপ ছাড়া দেখা যায় না তাকে। রকি বীচে অল্প কিছুদিন হলো এসেছে। মোটামুটি খাতির হয়ে গেছে আমার সঙ্গে। তবে বন্ধুত্ব যাকে বলে সেটা এখনও হয়নি।

সামনের ছেলেটাও কম যায় না। ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাপকে ধাক্কা মেরে আমার ওপর ফেলে দিল।

'এহ্‌হে, দিলে তো গামটা আমার গলায় ঢুকিয়ে!' আমার কাঁধে ঘুসি মেরে প্রতিশোধ নিল ক্যাপ।

'মুসিবত!' আমাদের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন মিস্টার হোমার। 'মুসিবত' বলাটা তাঁর মুদ্রাদোষ। বহুবার বহু জায়গায় নিয়ে গেছেন তিনি, যা সত্যিই মুসিবত ছিল আমাদের জন্যে। তবে শিক্ষক হিসেবে তিনি খারাপ নন, এটা স্বীকার করতেই হবে। যাই হোক, ওই একটা শব্দ দিয়েই বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি। আর কিছু বললেন না।

'জঙ্গলে আমাদের কাজটা কি?' মোড়ক খুলে আরেক টুকরো বাব্‌ল্ গাম মুখে পুরল ক্যাপ। 'কি খোঁজাবে?'

'কি আর, গাছপালা।'

গ্রীন ফরেস্টে কেন নিয়ে এসেছেন টীচাররা, আমিও ভালমত জানি না। ক্লাসে সেদিন কি সব নোটফোট নেয়ার কথা বলছিলেন। কান দিইনি।

'আই টেরি, বাব্‌ল্ গাম খাবে?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল টাকি। আমার আরেক বন্ধু।

টাকির পেছনে রয়েছে কডি। সে-ও বাব্‌ল্ গাম চিবুচ্ছে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো চিবানোর ওপরই নির্ভর করছে এখন তার বাঁচা-মরা।

'খাও কি করে এ ভাবে?' কডিকে জিজ্ঞেস করলাম। 'ব্রেইসে আটকায় না?'

চওড়া হাসি দিয়ে দাঁত বের করে দেখাল কডি। কিচ্‌কিচ্‌ করে কামড়াল। 'কই, আটকাল কই?'

ওর ব্রেইসের রঙ নীল। সুযোগ পেলেই দেখিয়ে দেয়। কেন কে জানে। এর মধ্যে বিকৃতি ছাড়া সৌন্দর্য কিছু আছে কিনা আমার অন্তত জানা নেই।

টাকির দেহটা খাটো, সেই তুলনায় মোটা। নাকের ওপর মস্ত এক আঁচিল। লম্বা লম্বা চুল।

কডির চুল রেশমের মত। দেখলে মনে হয় রঙ উঠে গেছে। ইদানীং দাঁতের মত চোখেও সমস্যা দেখা দিয়েছে তার। চশমা পরতে হচ্ছে।

পোশাক পরেছে দু'জনেই এক রকম–রঙ চটা জিন্‌স্‌, আর সাইজে বড় ঢলঢলে টি-শার্ট।

একে একে বাসে চড়তে লাগলাম সবাই।

সামনের সীটে বসে গেছে ইতিমধ্যে কিশোর আর রবিন। এখানেও আগে থাকা চাই ওদের। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে কিশোর, গোয়েন্দাগিরির বেজায় শখ কোঁকড়াচুলো ট্যাটনা শার্লকটার। তার দোস্ত রবিন ওরফে লালটুটা কোলের ওপর একটা নোটবুক নিয়ে কি যেন লিখছে। ঘামলে কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে মুখটা পাকা টমেটোর মত হয়ে যায় তার। সে-জন্যেই লালটু। অন্য পাশে জানালার ধারে বসা কালটুটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

এত জোরে আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল ক্যাপ, আরেকটু হলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম দুই সারি সীটের মাঝখানের গলিটাতে। আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সীটে বসে পড়ল সে। পিছলে সরে গেল জানালার ধারে।

'দেখো, খুব অন্যায় করলে!' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'আমি ওখানে বসতে চেয়েছিলাম।'

'সীটে তো আর তোমার নাম লেখা নেই। যে আগে বসতে পারে,' আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল সে। জোরে হাসলে বাঁশির মত তীক্ষ্ণ শব্দ বেরোয় তার গলা থেকে। এ মুহূর্তে ওর চেহারাটা লাগছে ডিজনির কমিকের লম্বা চারকোনা মুখওয়ালা কুকুরটার মত। বড় বড় কান দুটো বেজবল ক্যাপটার ওপর চেপে আছে।

'ফেরার পথে আমি কিন্তু জানালার কাছে বসব, আগেই বলে দিচ্ছি,' ক্যাপকে বললাম।

সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ, 'গ্রীন ফরেস্ট নাম কেন ওটার? ব্লু ফরেস্ট কিংবা রেড ফরেস্ট নয় কেন?'

'কারণ, বনটার মালিক ছিল গ্রীন নামে এক লোক,' জানালাম। 'অন্য নাম হলে বনটার নামও অন্য কিছু হত।'

'জানতাম,' ক্যাপ বলল। 'এমনি জিজ্ঞেস করলাম। তুমি জানো নাকি দেখার জন্যে।'

উফ্‌, কি মিথ্যুকরে বাবা!

ওর মাথার ক্যাপটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ঘুরিয়ে দিলাম। সামনের বারান্দাটা চলে এল ঘাড়ের ওপর। ক্যাপ নড়ানো পছন্দ করে না ও। বিশেষ করে এ ভাবে পেছনে ঘোরানো। চটে উঠল। তাতে খুশি হলাম আমি। জানালার কাছের সীট

দখলের প্রতিশোধ নিতে পেরে।

কয়েক মিনিট পর গ্রীন ফরেস্টের দিকে রওনা হলো বাস। আরও কয়েক মিনিট পর এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল। এবং আরও কয়েক মিনিট পর আবার সারি দিয়ে বাস থেকে নামা শুরু করলাম আমরা।

তাকিয়ে আছি বনের লম্বা লম্বা গাছগুলোর দিকে। মেঘে ঢাকা কালো আকাশের মাথা ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। এমন দিনে মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় না বেরোলেই কি হত না!

'তোমাদের ওঅর্ক শীটে দুটো কলাম বানাবে,' মিসেস ডকট্রিন বললেন। 'একটা বুনো প্রাণীর জন্যে, আরেকটা উদ্ভিদের।'

'তোমার নামটা গাছের সারিতে লিখে ফেলব নাকি?' হেসে জিজ্ঞেস করল আমাকে কডি।

কি ইঙ্গিত করেছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। 'তালগাছ' বোঝাতে চেয়েছে। ঘুসি মারলাম তার মাথা সই করে।

ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল সে। ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে লাগল। জিভের ডগায় চলে এসেছে বাব্‌ল্ গাম।

এত জোরে তার পিঠে থাপ্পড় মারল ক্যাপ, গামটা উড়ে চলে গেল মুখ থেকে।

ঘুসি মারতে গেল তাকে কডি। কিন্তু সরে গেল ক্যাপ।

ধরতে পারল না কডি।

ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিলেন আমাদেরকে টীচার। গাছপালার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া সরু একটা কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

বনের মধ্যে বেশি ঠাণ্ডা। অন্ধকারও বেশি। ইস্, সূর্য যদি উঠত!

'গাছের ওপরের ওই সবুজ জিনিসগুলো কি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ। 'মস নাকি? মস কি বুনো প্রাণী, না উদ্ভিদ?'

'প্রাণী হলেই বা আমার কি, উদ্ভিদ হলেই বা কি? বেঁচে থাকার জন্যে ওসব জানা জরুরী মনে করি না।'

ওঅর্ক শীটে খসখস করে কি যেন লিখল সে।

আমারটা ফাঁকা। কিছুই লিখিনি। আশেপাশে কতগুলো গাছ আর আগাছা দেখতে পাচ্ছি। ওসব ফালতু জিনিসের নাম লিখতে ইচ্ছে করল না।

'প্রাণীগুলো সব লুকিয়ে পড়েছে,' কয়েকটা ছেলেমেয়েকে বোঝাচ্ছেন মিসেস ডকট্রিন। 'খুঁজে বের করো। ভাল করে খুঁজলে লুকানো বাসাগুলোও পেয়ে যাবে।'

ওপর দিকে তাকালাম। ঘন পাতার জন্যে বাসাটাসা কিছু চোখে পড়ে না। চেষ্টা করলে হয়তো পাখির বাসা দেখা যায়, কিন্তু কে করে অত কষ্ট।

হঠাৎ শোনা গেল কিশোরের চাপা কণ্ঠ, 'হরিণ! হরিণ!'

তাকিয়ে দেখি পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে সে আর তার দুই দোস্ত। গাছপালার মাঝখানে সরু একটা ফাঁকের দিকে নজর। ঠোঁটে আঙুল রেখে সবাইকে চুপ থাকতে ইশারা করছে।

টাকি, কডি, ক্যাপ আর আমি দৌড়ে গেলাম। কিন্তু চোখমুখ কুঁচকে দৃষ্টি যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ করেও কিছুই দেখতে পেলাম না। 'কই হরিণ?'

'চলে গেছে,' কিশোর জানাল।

'অল্পের জন্যে দেখতে পারলে না,' বলল রবিন। ওঅর্ক শীটে 'হরিণ' শব্দটা লিখতে দেখলাম ওকে। তালিকায় আরও চারটে নাম যোগ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আমারটাতে একটাও নেই।

'বাদুড়টা দেখলে?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বাদুড়?' মাথা নাড়ল রবিন। 'না, দেখিনি।'

'ওই তো, ঝুলছে,' আমাদের পেছনে একটা গাছের ডাল দেখাল সে। 'ঘুমিয়ে আছে।'

ফিরেও তাকালাম না। ওই কুৎসিত কদাকার উল্টো হয়ে ঝুলে থাকা প্রাণীগুলোকে দেখতে বয়েই গেছে আমার।

'ওই যে বার্চ ট্রী,' কালটুটা বলল।

'আর ওটা উইপিং বীচ ট্রী,' বলল তার কোঁকড়াচুলো ওস্তাদ। লালটুটাকে বলল, 'লিখে ফেলো।'

ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে চলে গেছে কডি, টাকি আর ক্যাপ। ওদের ধরার জন্যে দৌড় দিলাম।

সবাই পরিশ্রম করছে। আমি বাদে। আমার অত নম্বরের দরকার নেই। বনে এসেছি মজা করতে, যাকে বলে পিকনিকের আনন্দ। কে যায় উদ্ভট বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে এখানে।

বনের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম আমরা। খানিক পর সূর্য উঠল। আলোর হলুদ রশ্মিগুলো মাটিতে এসে নামতে লাগল পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে।

বিষাক্ত পয়জন আইভির ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চাইলাম ক্যাপকে। আমার মতলব বুঝে লাফ দিয়ে সরে গেল সে। পা পিছলে পড়ে গেলাম।

মুখ তুলতেই চোখে পড়ল সাপটাকে।

মাত্র হাতখানেক দূরে।

উজ্জ্বল সবুজ রঙ। যথেষ্ট বড়।

দম আটকে ফেলেছি। অসহায় চোখে তাকিয়ে আছি বোবা হয়ে।

মাথা তুলল ওটা, চোয়াল ফাঁক করল, বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত বেরিয়ে এল চেরা লাল জিভটা।

ছোবল হানার ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে শুরু করল ফাঁক করা চোয়াল দুটো।

চোখ বন্ধ করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

দুই

তীক্ষ্ণ ব্যথার অপেক্ষা করছি।

কিন্তু এল না ব্যথাটা।

চোখ মেলে দেখি, সাপটাকে ধরে ফেলেছে মুসা।

'মু-মু-মুসা···' তোতলাতে শুরু করলাম।

'মু-মু না, শুধু মুসা। টেরি, সত্যি ভয় পেয়েছ?'

সাপটাকে আমার চোখের সামনে তুলে ধরল সে।

সাপের কালো চোখ দুটো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। থেকে থেকেই বেরিয়ে আসছে লাল জিভটা।

'এটা একটা নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের প্রজাতি, কামড়ালে কিছুই হয় না,' মুসা বলল। 'ঘাসের মধ্যে থাকে। ঢোঁড়া সাপকে ভয় পাও তুমি?'

পেছনে ট্যাটনা শার্লকটার পিত্তি জ্বালানো হাসি শুনতে পেলাম।

মাথায় হাত বুলিয়ে সাপটাকে আদর করল মুসা। তার আঙুলের ফাঁক গলে পিছলে নেমে যেতে শুরু করল ওটা।

'উঁম!···না না, ভয় পাই না! ভয় পাব কেন?' ঢোক গিলে বললাম। গলা কাঁপছে।

হেসে উঠল ক্যাপ। তীক্ষ্ণ বাঁশির মত স্বর।

আস্তে করে সাপটাকে মাটিতে নামিয়ে দিল মুসা।

লাফ দিয়ে সরে গেলাম। আবার যদি আমাকে কামড়াতে আসে।

কিন্তু নিঃশব্দে ঘাসের মধ্যে ঢুকে গেল ওটা।

চুক্ চুক্ শব্দ করে আমার দিকে তাকিয়ে করুণার ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল কালটুটা।

'এটার নাম লিখে রাখো,' রবিনকে বলল কিশোর। 'গ্রীন স্নেক। ওয়াইল্ড লাইফ কলামে। সাতটা হলো।'

'মুরগীর ছানাও লিখে ফেলি?' আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কালটু। 'আটটা প্রাণীর নাম হয়ে যেত।'

'বাজে কথা বলবে না!' চেঁচিয়ে উঠলাম। মনে হলো, মুরগীর বাচ্চার চিঁ-চিঁ স্বরই বেরোল গলা থেকে।

কডি, ক্যাপ আর টাকিকে আসতে বলে পা বাড়ালাম। গট্ গট্ করে এগিয়ে চললাম রাস্তা ধরে। পেছনে টিটকারি মেশানো হাসির শব্দ কানে আসছে।

'খারাপ লাগছে?' আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ।

রাগ দমন করতে কষ্ট হলো। এ ভাবে আর কতদিন ছাগল বানাবে আমাকে ট্যাটনার দল? অনেক চেষ্টা করেও ওদের হারাতে পারিনি একটিবারের জন্যেও। রাগটা সে-জন্যে বেশি হচ্ছে।

আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল ট্যাটনারা। হাতের ওঅর্ক শীটগুলো দোলাতে দোলাতে। যাওয়ার সময় হাত দিয়ে ছোবল মারার ভঙ্গি করল কালটুটা। সাপের মত হিস্‌হিস্ শব্দ করল। হেসে ফেলল তার লালটু দোস্ত।

'কিছু একটা করতে না পারলে এই সাপ নিয়ে বহুদিন জ্বালাবে আমাকে।' দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখতে পারলাম না।

'শুধু ওরা না,' কডি বলল। 'স্কুলের অনেকেই জ্বালাবে।'

পা টেনে টেনে এগোলাম। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চুইয়ে নেমে আসছে সোনালি রোদ। লাফ দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল একটা সুন্দর লাল রঙের কাঠবিড়ালী। কোন আগ্রহ নেই আমার।

মেজাজটা একেবারেই গেছে। হাঁদার বাচ্চা ঢোঁড়াটা পায়ের নিচে পড়ার আর সময় পেল না! আর কালটুটাও যেন ওত পেতেই ছিল।

সামনে হাসাহাসি শোনা গেল। কেউ হাসলেই এখন মনে হচ্ছে আমাকে নিয়ে

হাসছে।

'সাবধান, টেরি। শুঁয়াপোকা ! কামড়ে দেবে কিন্তু,' শুঁয়াপোকা দেখিয়ে হেসে উঠল একটা ছেলে।

'এক চড়ে দাঁত ফেলে দেব!' রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম।

রাস্তা ধরে হাঁটছি। বনের কিছুই যেন আর চোখে পড়ছে না এখন আমার। রাগে ঘোলা হয়ে গেছে মগজ। চোখ অন্ধ। সবাই যার যার ওঅর্ক শীট নিয়ে কাজ করছে, আমি বাদে।

কিছুই লিখছি না। গরম হয়ে উঠেছে ঘাড়। কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মুখে বসে বিরক্ত করছে সাদা রঙের খুদে মাছির দল। ওগুলোও যেন রসিকতা শুরু করেছে আমার সঙ্গে। থাপ্পড় মারতে গিয়ে নিজের গালেই ব্যথা পেলাম।

রাস্তাটা শেষ হতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। পার্কিং লটের কাছে বেরিয়ে এসেছি। ঘাসে ভরা মাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে স্কুল বাস।

বাসের কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে ভিড় জমিয়েছে ছেলেমেয়েরা।

টাকিকে দেখে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভিড় কিসের?'

ওকে কিছু বলতে হলো না। নিজেই দেখতে পেলাম।

গায়ে গা ঠেকিয়ে মুসাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ছেলেমেয়েরা। কেউ নড়ছে না।

সবার চোখ মুসার দিকে।

তিন

ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কালটুটা। মুখে স্মিত হাসি।

খেলা দেখাচ্ছে সে।

হাতের তালু মেলে ধরল। সবাইকে দেখাল, বড় বড় দুটো বোলতা হেঁটে বেড়াচ্ছে তার তালুতে।

বোলতা! দম আটকে এল আমার।

একটা বোলতা হাতের তালু থেকে কব্জি বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। ঘুরে আবার ওপরে উঠে এগিয়ে গেল বাহুর দিকে। অন্য বোলতাটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তালুতে।

মুসার সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার হোমার আর মিসেস ডকট্রিন। চোখে প্রশংসার দৃষ্টি।

মিস্টার হোমার হাসছেন।

মিসেস ডকট্রিন উদ্বিগ্ন। 'সাবধান, মুসা। দেখো, হুল না ফুটিয়ে দেয়।'

'ব্যথা না দিলে ফোটাবে না,' মোলায়েম গলায় বলল মুসা।

'অনুভূতিটা কেমন বলো তো?' জিজ্ঞেস করল একটা ছেলে।

'সামান্য সুড়সুড়ি লাগছে। আর কিছু না। হাতে নিয়ে দেখতে পারো।'

'না না, দরকার নেই,' পিছিয়ে গেল ছেলেটা।

মেয়েদের দিকে তাকাল মুসা। 'নেবে নাকি?'

আঁতকে উঠল কেউ। কেউ গোঙাল। নিজের হাতে বোলতা হাঁটছে কল্পনা

করে শিউরে উঠল কেউ কেউ। মোট কথা, কেউ নিতে রাজি হলো না।

'ছেড়ে দাও না বাবা! অনেক তো হলো,' অনুরোধ করল একজন। 'হুল ফোটালে বুঝবে মজা।'

বাহু বেয়ে শার্টের হাতার দিকে উঠে যাচ্ছে একটা বোলতা। শার্টের মধ্যে যদি ঢুকে যায়, বেরোতে না পেরে ঘাবড়ে গিয়ে হুল ফুটানো শুরু করে, তখন কি করবে কালটুটা!

চিৎকার যে করবে না, সেটা জানি। আমার চেয়ে বড় সাক্ষী তো আর নেই। কতগুলো মাকড়সা বয়ামে রেখে ওকে হাত ঢোকাতে বাধ্য করেছিলাম। কামড়ে কামড়ে অতিষ্ঠ করে ফেলেছিল মাকড়সাগুলো। টুঁ শব্দ করেনি ও।

অন্য বোলতাটাও হাত বেয়ে উঠতে শুরু করল ধীরে ধীরে।

'অতিরিক্ত সুড়সুড়ি!' হেসে ফেলল মুসা। ওর কোঁকড়া খাটো চুলগুলোকে রোদের আলোয় জট পাকানো তারের মত লাগছে। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে চোখের তারা।

দে বোলতা! দে কামড়ে! মনে মনে অনুরোধ করলাম পোকা দুটোকে।

স্বীকার করছি আমার ভাবনাগুলো ভাল নয়। কিন্তু কালটুটা আমাকে ভীষণ রাগিয়ে দিয়েছে। ওর শাস্তি হওয়াই উচিত।

'বোলতা, তোর পায়ে পড়ি! একটা ছোট্ট কামড়! মাত্র একটা! দে না ভাই!' কাতর অনুনয় করে বললাম। অবশ্যই মনে মনে।

কিন্তু ওরা বোধহয় থট রীডিং জানে না। মানুষের মনের কথা পড়তে পারে না। সে-জন্যেই আমার অনুরোধ রাখল না।

শার্টের হাতার কাছে গিয়ে ঘুরে গেল বোলতাটা। হাত বেয়ে নেমে চলে আসতে লাগল কনুইয়ের কাছে।

'বোলতারা খুব ভদ্র স্বভাবের,' মোলায়েম কণ্ঠে মুসা বলল।

দুটো বোলতাই এখন তার হাতের তালুতে।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল মুসা। অবাক লাগছে আমার। পোকা দুটোকে সামলাচ্ছে কি করে? উড়েও যাচ্ছে না। কামড়াচ্ছেও না।

বোলতাকে আমি ভীষণ ভয় পাই। ছোট বেলায় হুল ফুটিয়েছিল। সাংঘাতিক জ্বালা। তার পর থেকেই ভয়।

'আর কেউ করে দেখতে চাও?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

ভীত হাসি শোনা গেল ভিড়ের ভেতর থেকে। কিন্তু ওর পাগলামিতে সাড়া দেবার মত একজনকেও পাওয়া গেল না।

'টেরি। নাও,' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'তুমি আমার চেয়ে ভাল পারবে।'

আমি সরে যাবার আগেই বোলতা দুটো ছুঁড়ে মারল সে।

চিৎকার দিয়ে এক লাফে পিছিয়ে গেলাম।

চারপাশে হাসাহাসি শুরু হলো।

একটা বোলতা আমার কাঁধে বাড়ি খেয়ে গিয়ে ঘাসের ওপর পড়ল।

আরেকটা আমার পাশে দাঁড়ানো ক্যাপের টুপির বারান্দায় পড়ে ফড়ফড় করল খানিক। তারপর কলার বেয়ে ঢুকে গেল শার্টের ভেতরে।

চিৎকার করে উঠল ক্যাপ। বোলতাটাকে বের করার জন্যে পাগল হয়ে গেল। কুকুরের লেজের গোড়ায় মাছি বসলে যেমন উন্মাদ হয়ে যায়, ক্যাপেরও সেই

অবস্থা।

মজা পেয়ে চিৎকার করে আকাশ ফাটাচ্ছে ছেলেমেয়ের দল।

ঘাসে পড়ে যাওয়া বোলতাটার দিকে তাকালাম। বোঁ বোঁ করে লাফ দিয়ে উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল আমার মুখে।

ঝপ করে বসে পড়লাম মাটিতে। কোন দিকে না তাকিয়ে অন্ধের মত থাবা মারতে লাগলাম মাথার ওপরে। কোনমতেই বসতে দেব না।

ছেলেমেয়েদের চিৎকার, হাসাহাসি আর শিসের শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়।

কোলাহল ছাপিয়ে শোনা গেল মিস্টার হোমারের কণ্ঠ, 'এই, চলো সবাই। স্কুলে ফেরার সময় হয়েছে।'

চার

সে সীটের সারির মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল কালটুটা। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। দেখেও না দেখার ভান করে তাড়াতাড়ি সরে গেলাম।

কয়েকটা ছেলে বোলতার মত গুঞ্জন শুরু করল। কয়েকটা করতে লাগল সাপের মত হিস্‌হিস্‌। কাকে উদ্দেশ্য করে এ সব করছে ওরা, সবই বুঝতে পারলাম।

বাসের একেবারে পেছনের সীটে এসে বসলাম, কারও চোখে যাতে চোখ না পড়ে সে-জন্যে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ধপ্‌ করে আমার পাশে বসে পড়ল ক্যাপ। টুপির বারান্দাটা টেনে দিল চোখের ওপর।

একই সীটে আমাদের দুই পাশে এসে বসল টাকি আর কডি। প্রাণপণে বাব্‌ল্‌ গাম চিবাচ্ছে টাকি। ব্রেইসে আটকে যাওয়া গাম খোলার জন্যে পাগল হয়ে গেছে কডি।

বাস ছাড়ার আগে একটা কথাও বললাম না কেউ। তারপর শুরু হলো ক্ষোভ উদ্গিরণ।

নিচু গলায় কথা বলে উঠল ক্যাপ, 'ওই কালটুটা মনে করেছে কি একখান কাজ করে ফেলেছে!'

'ভাবখানা যেন দুনিয়ার কোন কিছুকে ভয় পায় না,' টাকি বলল। 'সুপারম্যান!'

'টেরির দিকে ওভাবে বোলতা ছুঁড়ে মারাটা কোনমতেই উচিত হয়নি তার! ভেবেছে কি নিজেকে!' কডি বলল। এখনও ব্রেইস থেকে গাম ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

'টেরির যে মুরগীর কলজে সেটা বুঝে গেছে আরকি,' ক্যাপ বলল। 'সেজন্যেই ছুঁড়ে মেরেছে। জানত কি কাণ্ড করবে।'

আর সহ্য করতে পারলাম না। চিৎকার করে উঠলাম, 'আর তোমার কিসের কলজে? কথা কম বলো! নাচাকুদাটা তো আমার চেয়ে তুমি বেশি করেছ।'

'রাগ করছ কেন? একটু রসিকতা করলাম।'

'সব সময় রসিকতা ভাল্লাগে না,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিলাম।

'কিন্তু এ হতে পারে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল টাকি। 'এমন কিছু না কিছু অবশ্যই আছে, যেটাকে ভয় পায় কালটুটা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কডি বলল, 'কত চেষ্টাই তো করা হলো। লাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে পর্যন্ত দেখলাম। ভয় তো পেল না। উল্টে বাজিতে হেরে নাস্তানাবুদ হলাম সবাই মিলে।'*

লাল আলো দেখে থেমে গেল বাস। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বনের ধারে মাডি ক্রীকে যাওয়ার রাস্তাটার কাছে থেমেছে। চটাৎ করে তুড়ি বাজিয়ে বললাম, 'পেয়েছি! পঙ্কদানবকে ভয় পাবে!'

গুরুত্ব দিল না তিনজনের কেউই।

'যা নেই সেটাকে আর কে ভয় পায়,' টাকি বলল। 'পঙ্কদানব কি আর আছে নাকি। গুজব। স্রেফ রূপকথা।'

'শুনেছি ভূত-প্রেতকে ভীষণ ভয় পায় ও।'

'ওরকম তো কত কথাই শুনেছি। কিন্তু ভয় পাওয়াতে পারলাম কই? তা ছাড়া ভূত পাবে কোথায়?'

জবাব দিতে পারলাম না।

আমাদের শহরে একটা গুজব আছে, মাডি ক্রীকের খাঁড়ির কিনারে কাদার নিচে বাস করে 'পঙ্কদানব' অর্থাৎ কাদার দানবেরা। পূর্ণিমার রাতে কাদার বাসা ছেড়ে উঠে আসে। কাদায় মাখামাখি, সারা গা থেকে কাদা ঝরে। শিকার খোঁজে। ধরতে পারলে টেনে নিয়ে যায় কাদার নিচে।

ভীষণ রোমাঞ্চকর গল্প। ছোটবেলায় বিশ্বাসও করতাম। আমার খালাত ভাই পিটার আমাকে প্রায়ই মাডি ক্রীকে নিয়ে যেত। পঙ্কদানবদের উঠে আসার গল্প বলত। হঠাৎ ভয় পাওয়ার ভান করে আঙুল তুলে বলত: ওই যে, দানব! দানব!

ভয় না পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। কিন্তু পারতাম না। আতঙ্কিত হয়ে দানবের হাত থেকে বাঁচার জন্যে দৌড়ে পালাতে চাইতাম।

পিটার এখনও আমাদের বাড়িতেই থাকে। এখানে থেকে পড়াশোনা করে। হাই স্কুলে পড়ে। আমার কয়েক বছরের বড়।

'পঙ্কদানবের কাহিনী নিয়ে একটা ছবি বানানোর কথা ছিল না পিটারের?' ক্যাপ জিজ্ঞেস করল, 'বানাবে?'

মাথা ঝাঁকালাম। 'বানাচ্ছে তো। দানব যা সাজে না, ভয়ঙ্কর! চমকে যেতে হয়।'

পিটার আর তার কয়েক বন্ধু মিলে স্কুলের জন্যে একটা ভিডিও ফিল্ম বানাচ্ছে। হরর মুভি।

আমাকে তাতে একটা চরিত্র দেয়ার জন্যে বহুত কাকুতি-মিনতি করেছি। শোনে না। হাসে। বলে, 'ঝুঁকি নিতে পারব না। সত্যি যদি কাদার দানবেরা উঠে আসে, তখন কি করবে?'

বোঝানোর চেষ্টা করি, এখন আমার বয়েস হয়েছে। কল্পিত কাদার দানব আর এখন ভয় দেখাতে পারবে না। কিন্তু ও কানেই তোলে না।

---

* শুটকি-বাহিনী দ্রষ্টব্য

ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করল বাস। সামনের দিকে চোখ পড়ল। পেছনে ফিরে কি যেন দেখছে মুসা। আমার চোখে চোখ পড়তে হাসল।

ব্যঙ্গ হয়তো করেনি আমাকে। কিন্তু পিত্তি জ্বলে গেল আমার। 'কালটুটাকে ভয় দেখানোর একটা উপায় বের করতেই হবে। বহুত জ্বালাচ্ছে। সবার সামনে ইয়ার্কি মারছে, সবাইকে হাসাচ্ছে। শীঘ্রি কিছু একটা করতে না পারলে স্কুলছাড়া করবে আমাকে।'

'কিন্তু কি করবে? ওর যা দুঃসাহস! সঙ্গে আছে আবার কুবুদ্ধি দেয়ার ওস্তাদ ট্যাটনাটা।' মাথা নাড়তে নাড়তে টাকি বলল, 'আমি তো কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।'

উপায় ভাবতে লাগলাম আমরা।

বুদ্ধিটা বের করল প্রথমে কডি। হাসি ফুটল মুখে। চশমাটা ঠেলে দিল নাকের ওপর। কাঁচের ওপাশে উত্তেজনায় চকচক করে উঠল চোখ দুটো। ফিসফিস করে বলল, 'উপায় একটা আছে।'

'কি!' ঝুঁকে পড়লাম ওর দিকে।

'আমার এক বন্ধুর একটা রবারের সাপ আছে,' ফিসফিস করে বলল কডি। তার উত্তেজিত হাসিটা ক্রমেই চওড়া হচ্ছে।

শোনার জন্যে এগিয়ে এল অন্য দু'জনও। মাথায় মাথা ঠেকে গেল আমাদের। বাস ঝাঁকি খেলে ঠুস্ ঠুস্ করে মাথায় বাড়ি লাগে।

'সাপকে ভয় পায় না ও,' ক্যাপ বলল। 'নিজের চোখেই তো দেখলে।'

'ওটা তো একটা অতি সাধারণ ঢোঁড়া সাপ,' কডি বলল। 'আমার বন্ধুর সাপটা অনেক বড়। কালো। গোখরা-টোখরা হবে। হাঁ করে থাকে। দাঁত দুটো যা, বাপরে! দেখলেই মনে হয় প্রচণ্ড রাগে ছোবল মারার জন্যে মুখিয়ে আছে…'

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আসল মনে হয়, নাকি নকল?'

সাংঘাতিক এক ঝাঁকি খেল বাস। হাতখানেক শূন্যে ছুঁড়ে দিল আমাদের। ক্যাপের মাথার সঙ্গে আমার মাথাটা এত জোরে বাড়ি খেল চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম।

'এক্কেবারে আসল,' আমরা যে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছি খেয়ালই করছে না কডি। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। 'ধরলেও প্রথমে জ্যান্তই মনে হয়। প্লাস্টিকের বুঝতে সময় লাগে।'

'সাংঘাতিক জিনিস!' জোরে বলতে গিয়ে তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল টাকি।

'আসলেই সাংঘাতিক,' কডি বলল। 'বহুবার ওটা দিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়েছে আমার বন্ধু। চেনা জিনিস। তারপরেও যতবার দেখেছি, ততবার ভয় পেয়েছি। একবার বালিশের নিচে হাত দিয়ে তো আমার মরার জোগাড়। বিকেল বেলা চুপ করে আমার বালিশের নিচে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল আমার বন্ধু। হাত দিতেই তো…ওরিব্বাপরে!'

'দুর্দান্ত সাহসী!' নির্বিকার কণ্ঠে বলল ক্যাপ।

অতিরিক্ত ফালতু কথা বলে ও। কান দিলাম না। কডির এত লেকচারের পরেও সন্দেহ গেল না আমার। 'সত্যি ভয় পাবে বলছ কালটুটা?'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কডি। 'কোন সন্দেহ নেই আমার। কালটু তো

কালটু, আসল সাপে দেখলেও ভয় পাবে ওটাকে।'

রসিকতাটা ভাল লাগল। হেসে উঠলাম আমরা। সামনের সীটের কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে দেখে নিল এত হাসির কি ঘটল। কিন্তু কিশোর, রবিন বা মুসা কেউ তাকাল না। গভীর মনোযোগে কি যেন লিখছে। ওঅর্ক শীটটা কপি করছে বোধহয়।

'দেরি সহ্য হচ্ছে না আমার,' বাসটা স্কুলের সীমানায় ঢুকতেই বলে উঠলাম। 'কডি, সাপটা আনতে পারবে তো?'

হাসল কডি। 'পারব না মানে? আমি বললে অবশ্যই দেবে।'

'হুঁ। তবে কেন নিয়ে যাচ্ছ ঘুণাক্ষরেও বলবে না কিন্তু।'

'মাথা খারাপ।'

'হুঁ,' টাকি বলল। 'কিন্তু ভয়টা দেখাবে কি করে?'

'ওর লাঞ্চ ব্যাগে রেখে দেব,' কডি বলল।

চওড়া হাসি মুখে লাগিয়ে বাস থেকে নেমে পড়লাম চারজনে।

পাঁচ

ক্লাসরুমের পেছনে একটা নিচু বুকশেলফে লাঞ্চ ব্যাগগুলো রাখি আমরা। বেশির ভাগ সময় ক্লাসে বসেই খেয়ে ফেলি। কালটুর ব্যাগটা তাকালেই চোখে পড়ে। কারণ সবচেয়ে বড়। খেতেও পারে বটে রাক্ষসটা।

বাড়ি থেকে কম করে হলেও দুটো স্যান্ডউইচ, দুই প্যাকেট ফলের রস, বড় এক প্যাকেট পটেটো চিপস, ফলের হালুয়া, আপেল আর প্রচুর পনির দিয়ে দেন তার মা। এত খাবার কি করে খায় ও, পেটের কোনখানে জায়গা করে, আমার মাথায় ঢোকে না।

পরদিন সকালে সামান্য দেরি করেই স্কুলে গেলাম। শেলফে রাখা আছে লাঞ্চ ব্যাগগুলো। একধারে কালটুর বাদামী রঙের পেটমোটা ব্যাগটা রাখা।

আমার ব্যাগটা শেলফের অন্য মাথায় রাখার সময় ওর ব্যাগটা দেখলাম ভাল করে। কডি কি কাজটা করতে পেরেছে? রবারের সাপটা রেখেছে ব্যাগের মধ্যে?

ওপর থেকে তাকিয়ে কিছু বোঝা যায় না। তবে কডির দিকে তাকাতেই বুঝলাম, কাজটা সেরে ফেলেছে। মুখ লাল। অস্বস্তি ভরা চোখে বার বার তাকাচ্ছে আমার দিকে।

হ্যাঁ।

হয়ে গেছে কাজ।

এখন সাড়ে তিনটা ঘণ্টা ধৈর্য ধরে কাটাতে হবে আমাদের। লাঞ্চের সময় পর্যন্ত।

এই টেনশনের মধ্যে কি আর পড়ায় মন বসানো যায়। খানিক পর পরই মুখ ফিরিয়ে ব্যাগটার দিকে তাকাচ্ছি।

কি কাণ্ডটাই না ঘটবে দেখতে পাচ্ছি কল্পনায়। মুসার দিকে তাকালাম। পাশাপাশি বসেছে তিন বন্ধু। সব সময় এ ভাবেই বসে ওরা।

কল্পনায় ওর আতঙ্কিত চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি। চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। লাফ দিয়ে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়েছে রবারের সাপ। বিষদাঁত দুটো বের করা। জ্বলন্ত কয়লার মত চোখ।

আতঙ্কে গলা ফাটাচ্ছে কালটুটা। আর সবাই করছে হাসাহাসি। নিজেকে দেখতে পেলাম কল্পনায়, শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছি। সাপটা তুলে নিতে নিতে বললাম, 'দূর, রবারের সাপ। এ দেখে ভয় পেলে তুমি? এত ভীতু? কি কাণ্ড!'

আত্মতৃপ্তিতে হাসলাম।

সারাটা সকাল ধরেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলাম আমরা–আমি, কডি, ক্যাপ আর টাকি। মিস্টার হোমার কি পড়ালেন, একটা বর্ণও কানে ঢুকল না।

ব্ল্যাকবোর্ডে কি লেখা হলো, ইংরেজি না অঙ্ক, জানিই না। সব কিছুই যেন জাবড়ানো। আঁকাবাঁকা রেখা। আমি আছি আমার চিন্তায়।

বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। আমরা চারজনেই।

অবশেষে এল সেই মহা প্রতীক্ষার লাঞ্চ টাইম।

সবাই গেল খাবার আনতে। আমরা রয়ে গেলাম পেছনে। একসঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে মুসা, রবিন আর কিশোর।

বুকশেলফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। তার ব্যাগের সামনে। প্রথমে রবিনের ব্যাগটা তুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। কিশোরেরটা কিশোর নিজেই নিল। মুসা ঝুঁকল নিজেরটা নেয়ার জন্যে।

ব্যাগগুলো নিয়ে যার যার ডেস্কে ফিরে এল ওরা। চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে তিনজনে মুখোমুখি বসল।

দম আটকে আসছে আমার।

এসে গেছে সময়।

এ ভাবে তাকিয়ে থাকলে সন্দেহ করবে। তাড়াহুড়ো করে ছুটলাম আমাদের ব্যাগগুলো তুলে নেয়ার জন্যে।

ফিরে এসে নিজেদের ডেস্কে বসলাম। কিন্তু ব্যাগের দিকে নজর দিতে পারছি না। মুসার দিকে আমার চোখ দুটো যেন আঠা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে।

ব্যাগ খুলতে শুরু করেছে মুসা।

ঠিক এই সময় ঘরের পেছন থেকে মিস্টার হোমারের মৃদু গোঙানি শোনা গেল। পরক্ষণে শোনা গেল তাঁর আর্তনাদের মত স্বর, 'হায় হায়···আমার ব্যাগ গেল কোথায়? নাকি ভুলে আনিইনি লাঞ্চ! কিন্তু মনে তো পড়ে এনেছিলাম!···কি জানি!'

'কোন অসুবিধে নেই, স্যার,' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল মুসা। 'প্রচুর আছে আমার কাছে।'

সামান্য দ্বিধা করে তার কাছে এগিয়ে এলেন মিস্টার হোমার। সামান্য ঝুঁকে কথা বলতে শুরু করলেন মুসার সঙ্গে। কি বলছেন তিনি, শুনতে পেলাম না। খাওয়ার সময় এখন সবারই যেন মুখ খুলে গেছে। খাচ্ছে আর হই-চই করছে।

ঘরে নীরব রয়েছি মাত্র আমরা চারজন। আমি আর আমার তিন বন্ধু। তাকিয়ে আছি মুসার দিকে। মিস্টার হোমারের দিকে।

'কি বলছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ। 'ব্যাগটা খোলে না কেন?'

'হয়তো জিজ্ঞেস করছেন, তাঁকে দিলে কালটুর খাবারে টান পড়বে কিনা,' কডি বলল।

জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলাম মুসার দিকে।

হাসল সে। তারপর লাঞ্চ ব্যাগটা তুলে দিল মিস্টার হোমারের হাতে।

'সর্বনাশ!' গুঙিয়ে উঠলাম। অসুস্থ বোধ করছি।

'দেব নাকি সাবধান করে?' ক্যাপ বলল।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। সাবধান করার আর সময় নেই।

মুসার ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাগের মুখ খুললেন মিস্টার হোমার। হাত ঢুকিয়ে দিলেন ভেতরে। কুঁচকে গেল ভুরু। অবাক হয়েছেন।

আচমকা তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়ে ব্যাগের ভেতর থেকে টেনে বের করলেন সাপটা।

হাত থেকে ব্যাগ ছেড়ে দিলেন। ঝাঁকি লেগে রবারের নরম সাপটা আসল সাপের মতই নড়ে উঠল তাঁর হাতে।

ঠিকই বলেছে কডি। এক্কেবারে আসল সাপের মত দেখতে।

আরেক বার চিৎকার দিয়ে সাপটাকেও ছেড়ে দিলেন মিস্টার হোমার। মেঝেতে পড়ে গেল সাপটা।

চিৎকার, চেঁচামেচিতে ভরে গেল ঘর।

চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। মিস্টার হোমারের কাছে গিয়ে আস্তে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিল তাঁকে। তারপর জুতো দিয়ে মাড়াতে শুরু করল সাপটাকে।

ভয় পায়নি।

কয়েক সেকেন্ড পর সাপটাকে তুলে নিয়ে এক টানে মাঝখান থেকে দুই টুকরো করে ফেলল। তারপর মাথাটা ছিঁড়ল। হাসল মিস্টার হোমারের দিকে তাকিয়ে।

'নকল সাপ, স্যার।'

চাপা আর্তনাদ করে উঠল কডি। 'আমাকে খুন করে ফেলবে আমার বন্ধু!'

'যাক, মিস্টার হোমারকে তো অন্তত ভয় দেখাতে পেরেছি,' স্কুল ছুটির পর বলল টাকি।

'সাপটা কে রেখেছে, তদন্ত করে সেটা বের করার চেষ্টা করলেই মরেছি,' ক্যাপ বলল।

'বার বার আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল ট্যাটনা শার্লকটা,' আমি বললাম। 'ওকে ফাঁকি দেয়া কঠিন। সন্দেহ করে বসেনি তো?'

'অসম্ভব না।'

'তবে যা-ই বলো, চেঁচানটা যা দিল না মিস্টার হোমার,' টাকি বলল, 'দেখার মত।'

'চেঁচানো আবার দেখে কি করে?' ভুরু নাচাল ক্যাপ।

'ওভাবেই তো বলে। ওই যে বলে, পানি খাব। পানি আবার খায় কি করে? পানি তো পান করে। অত ব্যাকরণ শুদ্ধ করে কি আর সব সময় কথা বলা যায়।'

বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লাম, 'আহ্, এ সব ফালতু কথা বাদ দাও তো। কিসের

মধ্যে কি।'

কডি এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। আমার ধারণা, ও সাপটার কথা ভাবছে। ভাবছে, বন্ধুকে গিয়ে মুখ দেখাবে কি করে। কি জবাব দেবে।

হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাড়ির কাছে চলে এসেছি। মিটিঙে বসা দরকার। কালটুটাকে ভয় দেখানোর জন্যে ভেবেচিন্তে আরেকটা বুদ্ধি বের করতে হবে।

দিনটা খুব সুন্দর। আবহাওয়া গরম। পুরো হপ্তাটাই গেছে বৃষ্টিতে। আজকে সূর্য উজ্জ্বল হলুদ। আকাশটা কেমন কাঁচের মত।

কিন্তু আমাদের মনটা আর উজ্জ্বল হতে পারছে না। বরং যেন বাংলাদেশী শ্রাবণের ভারী আকাশ। মুসাকে ভয় দেখাতে গিয়ে আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম ফেঁসে। সোজা প্রিন্সিপালের কাছে আমাদের ধরে নিয়ে যেতেন মিস্টার হোমার।

হেরে গেছি আমরা। মুসাই জিতল আবারও।

'নাহ্, রবারের সাপ দিয়ে কিছু হবে না,' রাস্তা পেরোনোর সময় বলল ক্যাপ। 'ভুল সিদ্ধান্ত ছিল ওটা।'

'কোনটা হলে শুদ্ধ হত, বলো তাহলে?' এতক্ষণে কথা বলল কডি, চোখ পাকিয়ে তাকাল।

'একটা কথা ভুলে যেয়ো না,' ক্যাপ বলল, 'মুসা একা নয়। তার সঙ্গে আছে রবিন আর কিশোর। কিশোরকে ফাঁকি দেয়া আমাদের সাধ্যের বাইরে। অন্য কিছু করা দরকার। জ্যান্ত কিছু দিয়ে। যেটার মধ্যে সূত্র পাবে না সে। যা থেকে বোঝা যাবে না, কেউ শয়তানি করেছে।'

'জ্যান্ত কি?' জিজ্ঞেস করলাম।

জবাব দিতে যাচ্ছিল ক্যাপ। বাধা দিল সাইকেলের বেল।

ফিরে তাকালাম। এসে গেছে ওরা! তিন গোয়েন্দা!

আমার পাশে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল কিশোর। মুসা এসে দাঁড়াল তার পাশে। রবিন পেছনে।

'টেরি,' কোন ভূমিকার মধ্যে গেল না কিশোর, সরাসরি আসল কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'মুসার লাঞ্চ ব্যাগে সাপটা কি তুমিই রেখেছিলে?'

'আমি রাখতে যাব কেন?' চিৎকার করে উঠলাম। লাথি মারলাম রাস্তার পাশের ঘাসে।

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। কুচকুচে কালো, ছুরির মত ধারাল চোখের দৃষ্টি যেন আমার মগজে গিয়ে বিঁধল।

তাকিয়ে থাকতে পারছি না। গরম হয়ে যাচ্ছে কান।

'তোমাকেই সন্দেহ করেছিলাম আমি,' কোঁকড়া ঘন চুলে আঙুল চালাল সে। 'তোমাকে তো চিনি। মনে হলো, প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না তুমি। কিসের কথা বলছি বুঝতে পারছ তো? সবুজ সাপটা।'

'না, আমি রাখিনি,' কথাটা সত্যি হওয়ায় জবাব দিতে পারলাম।

অস্বস্তি বোধ করছে ক্যাপ, কডি আর টাকি। ওদের অস্থিরতা, বার বার পায়ের ওপর ভার বদলানো দেখেই বুঝতে পারছি। আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে গুনগুন করে গান গাওয়া শুরু করল ক্যাপ।

মুচকি হাসল কিশোর। 'না, সত্যি তুমি রাখনি।'

পা তুলে প্যাডালে চাপ দিল আবার সে। আমাদেরকে একটা ধাঁধার মধ্যে

রেখে সাইকেল চালানো শুরু করল। তার পেছনে সারি দিয়ে এগোল তার দুই বন্ধু। দ্রুত চলে গেল রাস্তা ধরে।

'ব্যবস্থা একটা করতেই হবে ওদের,' দাঁতে দাঁত চেপে বললাম। ওদের ভাবভঙ্গিতে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে আমার। 'অন্তত একটিবারের জন্যে হলেও কাবু ওদের করতেই হবে।' ক্যাপের দিকে তাকালাম। 'জ্যান্ত কিসের কথা যেন বলছিলে তুমি?'

'না, বলছিলাম, কালটুটার পিঠে একটা জ্যান্ত টারান্টুলা ছেড়ে দিলে কেমন হয়?'

আমি জবাব দেবার আগেই হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল টাকি, 'দূর! মাকড়সা দিয়েই তো প্রথম ভয় দেখাতে গিয়েছিলাম। মাকড়সা ভর্তি বয়ামে দিব্যি হাত ঢুকিয়ে বসে রইল কালটুটা। কামড় খেয়েও চুপ। টুঁ শব্দটি করল না। তুমি তো আর দেখনি।'

'নিশ্চয় ওগুলো টারান্টুলা ছিল না?'

'তাতে কি?'

'বিষাক্ত ছিল না আরকি।'

'বিষাক্ত হলে বিপদে পড়ব আমরাই। টারান্টুলার কামড়ে যদি মরে যায় সে, কি অবস্থা হবে আমাদের ভেবেছ?'

নাহ্, এটা কোন বুদ্ধি হলো না। আমার সঙ্গে কডিও একমত।

বাড়িতে আমার ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে শলা-পরামর্শ করলাম। কিন্তু কোন উপায়ই বের করতে পারলাম না। ওরা যেন অপরাজেয়। কোন কিছু দিয়েই কাবু করা সম্ভব না।

দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে যার যার বাড়ি চলে গেল কডি, টাকি আর ক্যাপ।

বিছানায় বসে ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে ফেলার জোগাড় করলাম। দুই হাতে মাথা টিপে ধরলাম। কাঁধ বাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু উপায় আর বের করতে পারলাম না।

খুট করে শব্দ হলো।

মুখ তুলে তাকালাম। দরজা খুলে গেছে। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে।

লম্বা একটা দানব ঘরে ঢুকছে। সমস্ত গা কাদায় মাখামাখি। মুখ ভর্তি কাদা। তাল তাল কাদার নিচ থেকে উঠে এসেছে যেন।

ছয়

টলতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল দানবটা। সামনে বাড়ানো হাত থেকে কাদা ঝরে পড়ল।

ধরতে আসছে আমাকে।

চিৎকার করে উঠলাম, 'পিটার! দোহাই তোমার! যাও এখান থেকে!'

হাত নামাল পিটার। 'আসল কাদা নয় এগুলো। মেকআপ।'

'তো আমি কি করব?' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে ওর পেটে

মারলাম ধাক্কা। 'সরো, সরো! বেরোও! সব নোংরা করে ফেললে!'

হেসে উঠল সে। 'ভয় পেয়েছ?'

'উঁহু। আমি শুরু থেকেই জানতাম, তুমি।'

'মোটেও জানতে না। তুমি ভেবেছিলে সত্যি সত্যি কাদার দানব। স্বীকার করে ফেলো, তাতে দোষ নেই। তা না করলেই বরং বোঝা যাবে তুমি একটা ভীতু।'

ও যখন আমাকে ভীতু বলে খুব রাগ লাগে। আর সেটা সে জানে। জানে বলেই বলে। খেপে গিয়ে বললাম, 'কাদার দানব লাগছে না তোমাকে। লাগছে ডাস্টবিন থেকে উঠে আসা আবর্জনার মত।'

'আজ বিকেলে বনের মধ্যে কতগুলো ছেলেকে ভয় দেখিয়েছি আমরা,' হাসিমুখে বলল পিটার। 'ওদের চেহারাগুলো খালি যদি দেখতে। কাছে গিয়ে গলার স্বর দানবের মত করে জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছ? দুটো ছেলে চেঁচানো শুরু করল। বাকিগুলো দিল দৌড়। আহা, দেখার মত দৃশ্য!'

'বেরোও,' আরেক ধাক্কা দিয়ে ওকে দরজার দিকে ঠেলে দিলাম। সারা হাতে কাদা লেগে গেছে আমার।

'আমাদের ফিল্মটা প্রায় হয়ে গেছে,' পিটার জানাল। আমার খোলা নোটবুকটা তুলে নিয়ে কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাতের কাদা মুছতে লাগল। যে খাতাটাতে কাদা লাগাচ্ছে, সেটাতে অংকের নোট লিখে রেখেছি আমি। সেটা দেখে যেন আরও বেশি করে মুছতে লাগল। 'শেষ হয়ে গেলে তোমাকে দেখতে দেব।'

খানিকটা নরম হলাম। বোঝা যাচ্ছে পিটারের মেজাজ এখন ভাল। বললাম, 'দেখতে দেয়ার চেয়ে যদি ওটাতে একটা চরিত্র দিতে আমাকে, বেশি খুশি হতাম। দেবে?'

'না,' মাথা নাড়ল পিটার, 'নেয়া যাবে না। তুমি অতিরিক্ত ভীতু।'

'কে বলল?'

'ভীতুই তো তুমি। সীমাহীন ভীতু।' পুরু মেকআপ নেয়া কপাল চুলকাল পিটার। 'গহীন বনের ঘন কালো অন্ধকারে তিন তিনটে কাদার দানবকে দেখলে প্যান্ট খারাপ করে ফেলবে। ওগুলো আসল দানব নয় জানা থাকা সত্ত্বেও। আর কোন কারণে যদি আসল পঙ্কদানবেরা বেরিয়ে আসে, তাহলে তো···'

'হয়েছে, থামো,' রাগটা দমন করে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। 'তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে বলেই···'

'না, আমি দিইনি।' কাঁধ থেকে কাদার দলা খসে পড়ে কার্পেটটা নষ্ট করে দিল আমার। সেদিকে তাকিয়ে বেশ একটা দরাজ হাসি দিল পিটার। 'অনেক মোছামুছি করতে হবে তোমাকে।'

'তোমাকে ধরে এখন ওগুলো খাওয়াতে পারলে তবে গিয়ে শিক্ষা হয়!' ও আমাকে কোনমতেই অভিনয় করতে দেবে না বুঝে রাগটা আর চাপা দিতে পারলাম না কোনমতেই।

সে মেজাজ খারাপ করল না। বরং হাসিটা আরও বাড়ল। 'তোমার কোন সমস্যা হয়েছে, তাই না? কোন কারণে রেগে আছ তুমি। মেজাজ ভারপাতলা হয়ে যাচ্ছে সে-জন্যে। ঠিক রাখতে পারছ না।'

'তুমি জানলে কি করে?' সন্দেহ জাগল আমার মনে। স্কুলের ঘটনাটা কি জেনে গেছে নাকি?

'তোমার কাণ্ড দেখেই বোঝা যায় সব।'

হঠাৎ রাগ ভুলে গিয়ে বলে উঠলাম, 'পিটার, আমাকে সাহায্য করবে?'

'কি সাহায্য?'

'একজনকে ভয় দেখাতে হবে।'

চোখের পাতা সরু করে আমার দিকে তাকাল পিটার। 'কাকে?'

খানিক দ্বিধা করে অবশেষে বলেই ফেললাম, 'আমার এক বন্ধুকে। তিন গোয়েন্দাকে তো চেনো, তাই না?'

'ভয় দেখাবে কেন?' দস্তানা পরা একটা ফোলা হাত ড্রেসারের ওপর রাখল সে।

'স্রেফ মজা করার জন্যে। তুমি যা করতে এলে এইমাত্র।'

মাথা ঝাঁকাল সে। বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না।

'কোনমতেই ওদের ভয় দেখাতে পারিনি আমরা,' বললাম ওকে। 'অনেক চেষ্টা করেছি। সব সময় আমাদের চেয়ে এগিয়ে থাকে।'

'কি কি করেছিলে?' জানতে চাইল পিটার।

'মাকড়সা দিয়ে চেষ্টা করেছি। লাশ ধোয়ার ঘরে টেনে নিয়ে গেছি রাতের বেলা। উল্টো আমাদেরকেই ভয় দেখিয়ে দিয়েছে।'

'তারমানে আরও বড় কিছু দরকার।' ড্রেসারের কাছ থেকে সরে গেল সে। কাদা লাগিয়ে দিয়েছে ওতেও।

'বড় কিছু মানে?'

'মাকড়সা একটা জিনিস হলো নাকি। অনেক বড় কিছু দরকার। যাকে সবাই ভয় পায়।'

'বাঘের কথা বলছ নাকি?'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল সে, 'না না, বাঘ পাবে কোথায়? কুকুরের কথা বলছি আমি। সবাই ভয় পায়, তাই না? ধরো, অনেক বড়, রাগী চেহারার একটা কুকুর যদি হয়?'

'কুকুর?' মাথা চুলকালাম আমি।

'হ্যাঁ।...তিন গোয়েন্দার কোনটাকে ভয় দেখাতে চাও তুমি?'

'মুসাকে।'

'বেশ। ধরা যাক, একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে। বনের মধ্যে হলে আরও ভাল হয়। হঠাৎ কানে এল ক্রুদ্ধ গর্জন। ফিরে তাকিয়ে দেখে বাঘের মত এক কুত্তা দাঁত বের করে, লাল জিভের লালা গড়াতে গড়াতে দৌড়ে আসছে তার দিকে। ভয় পেতে বাধ্য। কি বলো?'

বুদ্ধিটা মন্দ না। অচেনা কুকুরকে আসলেই ভয় পায় মানুষ। খুশি হয়ে উঠলাম। 'পিটার, সত্যি, তুমি একটা জিনিয়াস।'

'তোমার আগে অনেকেই এ কথা বলেছে আমাকে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। প্রচুর কাদা রেখে গেল ঘরের এখানে ওখানে। সেগুলো এখন মুছতে হবে আমাকে।

তবে সে-জন্যে আর রাগ হচ্ছে না এখন। চমৎকার একটা বুদ্ধি দিয়ে গেছে।

দৃশ্যটা কল্পনা করতে লাগলাম। মস্ত একটা কুকুর। মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে নেকড়ের মত হাঁক ছাড়ছে।

নিশ্চিন্ত মনে শিস দিতে দিতে অন্ধকার রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে কালটু। হঠাৎ চাপা গর্জন শুনতে পেল পেছনে। কি করবে?

অবশ্যই থমকে দাঁড়াবে। চোখ বড় বড় হয়ে যাবে ভয়ে।

ভাববে, কিসের গর্জন?

তারপর দেখতে পাবে ওটাকে। ভয়ঙ্কর একটা কুকুরের মত প্রাণী তাকিয়ে আছে তার দিকে। লাল লাল চোখ। দাঁত বের করে রেখেছে।

তারপর পিলে চমকানো গর্জন ছেড়ে লাফ দিয়ে যখন টুঁটি কামড়ে ধরতে যাবে ওটা, কালটুর অবস্থা তখন কি হবে?

'বাঁচাও! বাঁচাও!' করে চিৎকার দিয়ে দেবে দৌড়।

খানিকক্ষণ ভয় পেতে দেব ওকে। তারপর ডাক দেব, 'এই, আয়! আয়!'

বাধ্য, লক্ষ্মী ছেলের মত থেমে যাবে কুকুরটা। লেজ নাড়তে নাড়তে ফিরে আসবে আমার কাছে।

কালটু তখনও থরথর করে কাঁপছে।

'হায় হায়, কুত্তাকে ভয় পাও?' আমি বলব তখন। বনের ভেতর সাপটাকে দেখিয়ে আমাকে যেমন করে ইয়ার্কি মেরেছিল। 'এ তো একটা অতি সাধারণ কুকুর। দেখো না কি রকম হাত চাটছে আমার। একে এত ভয় পাও?'

মুসার তখনকার চেহারাটা কল্পনা করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। পাগলের মত হা-হা করে হাসতে লাগলাম একা একাই।

নাহ্, পেয়ে গেছি উপায়। পিটার সত্যি বুদ্ধিমান। প্রচণ্ড উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপতে শুরু করলাম আমি।

কিন্তু কথা হলো, ওরকম একটা কুকুর পাই কোথায়?

সাত

নিবারে বিকেলে গিয়ে হাজির হলাম টাকিদের বাড়িতে। পেছনের বাগানে কাজ করছিল সে। আমাদের দেখে এগিয়ে এল।

মেঘলা দিন। ভারী মেঘে সূর্য ঢেকে দিয়েছে। মন খারাপ করে দেয়া ছায়া পড়েছে বাগানে।

পাশের বাড়িতে ঘাস কাটার যন্ত্র চলছে। সেটার আওয়াজে কথা বলাই কঠিন। টাকি, কডি আর ক্যাপকে জানালাম আমার পরিকল্পনার কথা।

'ভয়ঙ্কর একটা কুকুর, ঠিক বলেছে,' ক্যাপ বলল। টুপির বারান্দা ধরে একটানে নামিয়ে দিল আরও খানিকটা।

ভ্রূকুটি করল কডি। 'ঠিক তো বলেছেই। কিন্তু ভয়ঙ্কর সেই কুকুরটা পাব কোথায়?'

'কেন, আমার এডিকের কথা ভুলে গেলে?' টাকি বলল।

'দূর, ওকে দিয়ে হবে না,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লাম। 'একটা মাছিও

ওকে ভয় পাবে না।'

কুটিল হাসি ফুটল টাকির মুখে। 'পারবে। এডিকই পারবে।'

'হ্যাঁ, তা তো পারবেই,' মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। 'নেকড়ের ছানা কিনা।'

'নেকড়ে কে বলল? বাঘের বাচ্চা। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।' গলা চড়িয়ে এডিকের নাম ধরে হাঁক দিল টাকি।

মুহূর্তে বাড়ির পাশ ঘুরে ছুটে বেরোল একটা বিশাল সেইন্ট বার্নার্ড কুকুর। লাফাতে লাফাতে ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকে। রোমশ লেজটা নাড়াতে গিয়ে এমন করে নাড়াচ্ছে পেছনটা, ভয় হচ্ছে পেটের কাছ থেকে ছিঁড়ে না যায়। কে বলেছে ওকে এত জোরে নাড়াতে! টকটকে লাল জিভটা আধহাত বেরিয়ে গেছে। ভয় তো লাগেই না ওই জিভ দেখলে, বরং মনে হয় কুকুরের প্রতিবন্ধী।

'বাবাগো! কি ভয়ঙ্কর!' কুঁকড়ে গিয়ে ভয়ে আধমরা হয়ে যাওয়ার ভান করলাম।

আমার দিকে ফিরেও তাকাল না এডিক। সোজা গিয়ে টাকির হাত চেটে দিতে শুরু করল। অবিকল বিড়াল ছানার মত মিউ মিউ করছে। এতবড় একটা কুকুরের এই কাণ্ড দেখে রাগই হতে লাগল। মনে হলো, দেই কষে এক লাথি মেরে। তা তো আর করা যাবে না, টাকি দুঃখ পাবে। তাই ইয়ার্কি মেরে বললাম, 'ছোটবেলায় মরা বিড়ালের দুধ খেয়েছিল নাকি?'

মাথার ক্যাপ ঠিকমত বসাতে বসাতে আমার পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাপ। 'যাই বলো, সাইজ কিন্তু খারাপ না। কিন্তু ভয় তো লাগে না দেখে। আমাদের দরকার আসলে একটা নেকড়ের বংশধর। কিংবা ডোবারম্যান।'

এডিক হয়তো ভাবল তার প্রশংসাই করছে ক্যাপ। মস্ত মাথাটা ঘুরিয়ে ক্যাপের হাত চেটে দিতে এল।

'আরে সর্, সর্!' মুখ বাঁকিয়ে ধমক লাগাল ক্যাপ। 'কুত্তার লালা দেখলে আমার বমি আসে। ওয়াক, থুহ্!'

'তারমানে সমস্যাটা থেকেই গেল আমাদের,' আমি বললাম। মনে করার চেষ্টা করলাম, 'আমাদের জানামতে ওরকম কুকুর কার আছে? একটা গার্ড ডগ দরকার। কিংবা জার্মান শেফার্ড। এর কমে হবে না।'

হাসিটা মোছেনি এখনও টাকির মুখ থেকে। রহস্যময় কণ্ঠে বলল, 'এডিককে একটা সুযোগ দিয়েই দেখো। ভয় যদি না দেখাতে পারে তো আমার নাম টাকি নয়।'

একটুক্ষণের জন্যে সরেছিল। আবার এসে সূর্যের মুখ ঢেকে দিল ভারী মেঘ। ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাতাস। ধূসর ছায়া পড়ল ঘাসের ওপর।

পাতাবাহারের বেড়ার অন্যপাশে থেমে গেল ঘাসকাটা যন্ত্রের শব্দ।

ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল এডিক। চার পা শূন্যে তুলে দিয়ে এমন করে তাকাল যেন কি একখান বাহাদুরিই না করে ফেলেছে।

মুখ বাঁকাল আবার ক্যাপ। 'এত বোকা কুকুর তো জীবনে দেখিনি! গাধাকেও হার মানায়!'

'গাধা বোকা, কে বলল তোমাকে?' ভুরু নাচাল টাকি। 'আমি তো বহুত বুদ্ধির কাজ করতে দেখেছি গাধাকে। যাকগে, এডিকের ব্যাপারে এখনই মত

বদলাবে।'

কুকুরটার দিকে ফিরে শিস দিতে আরম্ভ করল সে। তীক্ষ্ণ, সুরবিহীন শিস।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো বিশাল কুকুরটার মাঝে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল। পেছনে বন্দুকের নলের মত সোজা হয়ে গেল লেজটা। শরীর শক্ত। মাথার পেছনে খাড়া হয়ে উঠল কান দুটো।

শিস দিয়েই চলেছে টাকি। জোরে নয়। আস্তেও নয়। সুরবিহীন, নষ্ট বাঁশির মত।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি।

গজরানো শুরু করেছে এডিক। গলার গভীর থেকে শুরু হলো প্রথমে। চাপা, ভীষণ ভারী শব্দ। ভয়ঙ্কর।

ওপরের কালো ঠোঁটটা মাটীর ওপরে তুলে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল দাঁত।

বিকট ভঙ্গি।

গজরানোটা বাড়ছে।

রাগে জ্বলছে চোখ দুটো। মেরুদণ্ডের ওপরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। মাথাটা সোজা করে দিয়েছে, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে।

দম নিয়ে আবার শিস দিতে লাগল টাকি। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে কুকুরটার চোখে।

'এডিক! ধর্ টেরিকে! ধর!' চিৎকার করে উঠল টাকি।

আট

-না! না!'

চিৎকার দিয়ে পাতাবাহারের বেড়ার দিকে পিছাতে গেলাম। কিসে যেন পা বেধে গেলাম চিত হয়ে পড়ে।

লাফ দিয়ে আমাকে ধরতে এল কুকুরটা। দুই হাত বর্মের মত বাড়িয়ে দিলাম সামনে।

কুকুরটা এসে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন এল না, হাত নামালাম আস্তে করে। দেখি, গলা জড়িয়ে ধরে এডিককে আদর করছে টাকি। হাসিতে ভরে গেছে মুখ। লালায় ভরা জিভ দিয়ে তার মুখ চেটে দিচ্ছে কুকুরটা।

আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল টাকি, 'কি বুঝলে?'

বোকার মত হাসল কডি।

'বাপরে!' উঠে বসলাম দুর্বল ভঙ্গিতে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাচ্ছে। উঠে দাঁড়াতেই চোখের সামনে বোঁ করে চক্কর মারল দুনিয়াটা।

'দারুণ দেখাল তো!' প্রশংসা না করে পারল না আর ক্যাপ। 'শেখালে কি করে?'

'আমি শেখাইনি।' শেষবারের মত গলা চাপড়ে আদর করে কুকুরটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল টাকি। 'ব্যাপারটা দুর্ঘটনাই বলতে পারো। একদিন শিস দিতে গিয়ে

দেখি আমাকে খেয়ে ফেলার জোগাড় করল এডিক। এমনভাবে গজরানো শুরু করল, ভয় পেয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে গাছে উঠেছিলাম। শিস বন্ধ হতেই আবার আগের মত হয়ে গেল সে।'

'তারমানে তোমার ওই বেসুরো শিস শুনলে ওরও পিত্তি জ্বলে যায়,' আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে শুরু করেছি আমি।

'শিস শুনলেই ও খেপে যায়,' টাকি বলল। 'সেটা যে কেউই দিক না কেন। মনে হয় কানেটানে লাগে, সহ্য করতে পারে না। জানি না। যা-ই হোক, কি করল দেখলে তো? যতবার শিস দেবে ততবার ওরকম করবে।'

'দারুণ! দারুণ!' ক্যাপ বলল।

'টেরির তো জান উড়িয়ে দিয়েছিল,' কডি বলল।

ধীর চালে শরীর দুলিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে রওনা হয়ে গেল কুকুরটা। লম্বা জিভটা প্রায় মাটির কাছে নেমে গেছে। ফুলের বেডে কিসের যেন গন্ধ শুঁকল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির আড়ালে।

'বেচারা!' টাকি বলল। 'আমার মনে হয় ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া সহ্য করতে পারছে না ও। সব সময় গরমে কাতর হয়ে থাকে। অথচ মিশিগানে থাকতে এমন করত না। বাবা বলেছিল, কাউকে দিয়ে আসতে। কিন্তু মা কোনমতেই রাজি হলো না।'

'ভাল হয়েছে,' খুশি হয়ে বললাম। 'কালটুটাকে জন্মের শিক্ষা দিয়ে ছাড়তে পারব আমরা।'

পকেট থেকে ছোট একটা বল বের করে মাটিতে ড্রপ খাওয়াল কয়েকবার কডি। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কামড়ে দেয় যদি? যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়...'

'যাবে না,' টাকি বলল। 'আমি শিস দেয়া বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ও থেমে যাবে। গর্জন-ফর্জন সব বাদ দিয়ে একেবারে ভদ্রলোক।'

'তাহলে ঠিক আছে।' আবার মাটিতে ড্রপ খাওয়ানো শুরু করল বলটাকে।

খেলার প্রতি কোন আগ্রহ নেই আমাদের। তারচেয়ে কালটুটাকে কি করে ঘোল খাওয়ানো যায় সেই আলোচনা অনেক বেশি মজার।

মেঘের ভেতর থেকে আবার উঁকি দিল সূর্য। ছোট করে ছাঁটা ঘাসগুলো পড়ন্ত আলোয় চকচক করতে লাগল। বাগান আর আঙিনা পেরিয়ে পেছনের আঙুর ঝোপটার কাছে এসে বসলাম আমরা।

'বনের মধ্যেই ভয় দেখাব আমরা ওদের,' আমি বললাম। 'কোথায়, জানো? মাডি ক্রীকে ওরা যেখানে গাছের মাথায় ঘর বানিয়েছে, ট্রী-হাউস, ওখানে।' মাথার নিচে দুই হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম ঘাসের ওপর। 'ভয় দেখানোর জন্যে হাউস উপযুক্ত জায়গা। বনের মধ্যে যখন থাকবে ওরা, আশেপাশে অন্য কেউ থাকবে না, হঠাৎ গর্জন করতে করতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে যাবে এডিক। পাগল কুত্তা ভেবে সেই যে চেঁচানো শুরু করবে ওরা, এক হপ্তা ধরে চেঁচিয়েই যাবে। কেউ থামাতে পারবে না।'

'আমারও তাই ধারণা,' ক্যাপ বলল। 'লুকানোর জন্যে প্রচুর জায়গা পাব আমরা। কোন ঝোপটোপে লুকিয়ে বসে শিস দিতে থাকবে টাকি। এমন কেন করল কুকুরটা, বুঝতেই পারবে না কালটু আর তার দোস্তরা।'

আসনপিঁড়ি হয়ে বসে দাঁত দিয়ে নখ কামড়াচ্ছে কডি। চিন্তিত মনে হচ্ছে ওকে। 'আমার কিন্তু ভাল লাগছে না। স্কুলে সবার সামনেই যদি ওদের টিট করতে না পারলাম, লাভটা কি হলো? কেউ যদি না-ই দেখল, আনন্দটা কিসের?'

'আমরা তো দেখব,' আমি বললাম। 'আমরা চারজন। স্কুলে গিয়ে রাষ্ট্র করে দেব। বিশ্বাস করাতে অসুবিধে হবে না। আর যদি কেউ বিশ্বাস না-ও করে, না করুক, আমাদের তো শান্তি। মনকে বোঝাতে পারব, শেষ পর্যন্ত ভয় দেখাতে পেরেছি কালটুটাকে।'

'ভয় আসলে ও সব সময়ই পায়,' টাকি বলল, 'স্বীকার করে না আরকি। আমাদের দেখাতে চায় না কোনমতেই।'

'সেটাই এবার দেখব। বাজিটাজির ব্যাপার নেই তো। আগে থেকে সাবধান থাকতে পারবে না।'

'তা ঠিক,' একমত হলো ক্যাপ।

'কবে করছি কাজটা?' কডি জিজ্ঞেস করল।

'এক্ষুণি যদি যাই?' লাফিয়ে উঠে বসলাম আমি।

'এখন!' টাকি অবাক।

'কেন নয়? অসুবিধে কি?' আমি বললাম। 'আজকে ছুটির দিন। নিশ্চয় গিয়ে গাছে উঠে বসেছে ওরা। জন্তু-জানোয়ার দেখছে আর মজা করে হাওয়া খাচ্ছে। এখন গেলে হাওয়া খাওয়া ওদের বের করা যাবে।'

'ঠিক!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসে আছ কেন আর? ওঠো।'

'দাঁড়াও,' টাকি বলল। 'এডিকের গলায় শিকল পরিয়ে নিয়ে আসি। সত্যি, বুদ্ধি যখন পাওয়া গেছে, দেরি করার কোন মানে হয় না।'

'যাওয়ার আগে আরেকটা কাজ করে নিলে হয় না?' কডি বলল। 'ওরা আছে কিনা আগে শিওর হওয়া দরকার।'

'কি ভাবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'খুব সহজ।' বলে কিশোরের স্বর নকল করে বলল কডি, 'হালো, মুসা, দশ মিনিটের মধ্যে ট্রী-হাউসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

অবিশ্বাস্য! অদ্ভুত! তাজ্জব হয়ে গেলাম।

'কডির যে এত ক্ষমতা, তা তো জানা ছিল না,' হাসতে হাসতে বলল টাকি।

'ইদানীং প্র্যাকটিস করছি আমি,' কডি জানাল। 'অনেক কিছুর স্বর নকল করতে পারি।'

'চলো, ভেতরে গিয়ে কথা বলি,' টাকি বলল। 'বাড়ি না পেলে বুঝতে হবে বনে চলে গেছে। আর বাড়ি থাকলে কিশোরের নাম ভাঁড়িয়ে কডি ওকে যেতে বলবে।'

রান্নাঘরের দিকে রওনা হলাম। ঘরে ঢুকে ফোনটা কডির দিকে বাড়িয়ে দিল টাকি। তারপর কর্ডলেস ফোনটা গিয়ে নিয়ে এল আমরা সবাই যাতে শুনতে পারি।

মুসাদের নম্বর টিপল কডি।

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। এক···দুই···

তৃতীয়বার বাজার আগেই ফোন তুলে নিল মুসা। 'হালো?'

'মুসা?' কিশোরের কণ্ঠস্বর নকল করে বলল কডি। 'আমি।' এত চমৎকার নকল করল সে, কিশোরের চাচী শুনলেও চিনতে পারত না।

'বনে চলে এসো। ট্রী-হাউসে। আমি ওখানেই যাচ্ছি।'

'কে বলছ?'

'আরে আমি। চিনতে পারছ না? আমি কিশোর।'

'আশ্চর্য!' স্পষ্ট শুনতে পেলাম সবাই মুসার কথা। 'তুমি যদি কিশোর হও তাহলে আমার সামনে দাঁড়ানো কিশোরটা কে? কিশোরের ভূত!'

'রঙ নাম্বার!' বলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন রেখে দিল কডি।

মুসাকে ফোন করার বুদ্ধিটাই একটা বাজে বুদ্ধি ছিল, এতক্ষণে মাথায় ঢুকল আমাদের। একটিবারও চিন্তা করিনি, মুসাদের বাড়িতে থাকতে পারে কিশোর। আমাদের কপালটাই খারাপ!

যাকগে। চেষ্টা করে দেখা হলো। কাজে লাগল না। কি আর করা। তবে এডিককে দিয়ে ভয় দেখানোটা এখনও সম্ভব।

সেদিন আর হলো না।

পরদিন রবিবার। বৃষ্টি যে শুরু হলো আর থামাথামির নাম নেই। হতাশ হয়ে পড়লাম।

আমার পাশে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে পিটার। বৃষ্টি দেখছে। কাঁচের গায়ে আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। তারও মেজাজ খারাপ। পঙ্কদানবের ছবির শূটিং শেষ করার কথা ছিল আজ।

'কাদা থেকে দানবেরা কি ভাবে ওঠে, দেখানো হবে ছবির শেষে,' পিটার বলল।

'ভেবো না, বৃষ্টি থেমে যাবে,' ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু নিজেই সান্ত্বনা পাচ্ছি না।

'এখন বৃষ্টি থামলেও লাভ হবে না,' মুখে হাসি ফুটল না পিটারের। 'শূটিং করা যাবে না আজ।'

'কেন?'

'অতিরিক্ত কাদা।'

'কাদাই তো দরকার।'

'কাদা দরকার খাঁড়ির বুকে। অন্য জায়গায় কাদা থাকলে ক্যামেরা বসাব কি করে?'

নয়

পরদিন সোমবার। স্কুল খোলা। বনে যাওয়ার সুযোগ নেই।

তারপর থেকে প্রতিদিনই স্কুল খোলা। পুরো হপ্তাটাই গেল গড়িয়ে গড়িয়ে। বৃষ্টির বিরাম নেই। থেকে থেকেই হচ্ছে।

শনিবারে সূর্যের মুখ দেখা গেল। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম আমরা। এডিকের গলায় শিকল পরিয়ে বনে রওনা হলাম সবাই।

'কিশোররা আজকে যাবেই যাবে,' আশা করলাম আমি। 'এতদিন স্কুল আর বাড়ি, বাড়ি আর স্কুল করে করে ওরাও নিশ্চয় বিরক্ত হয়ে গেছে।'

'আগে একজন গিয়ে দেখে আসা উচিত ওরা এল কিনা,' কডি বলল। 'যদি বলো, আমিও গিয়ে দেখে আসতে পারি।'

'হ্যাঁ, যাও। এবং গিয়ে সেদিনকার মত ডোবাও,' ক্যাপ বলল। 'মুসার স্বর নকল করতে গিয়ে কি ধরাটাই না খেলে। তোমার ওপর ভরসা নেই।'

'কিশোর যদি গিয়ে মুসাদের বাড়িতে বসে থাকে আমি কি করব?' রেগে উঠল কডি। 'আমার গলা শুনে তো আর চিনতে পারেনি।'

'থাক থাক, হয়েছে,' বাধা দিলাম। 'ঝগড়া করার আর দরকার নেই।'

তবে পরিস্থিতি খারাপ হলো না। সবাই খুব হালকা মেজাজে আছি। আত্মবিশ্বাসে ভরা মন। মনে হচ্ছে আজ কালটুটাকে ভয় দেখাতে পারবই।

টাকিদের বাড়ির কয়েক ব্লক পর থেকেই বনের শুরু। ওখানে পৌঁছতে সময় লাগবে না।

দিনটা সত্যি চমৎকার। বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়ে তরতাজা হয়ে গেছে সব কিছু। বাতাসে এক কণা ধুলা নেই। পাতাগুলো ঘন সবুজ। এক ধরনের মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে।

রাস্তার ধারে ফুল, পাতা, ঝোপ যা পাচ্ছে থেমে থেমে গন্ধ শুঁকছে এডিক। শিকল ধরে টানতে টানতে চলেছে টাকি। কঠিন কাজ। এত বড় একটা সেইন্ট বার্নার্ডকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে টেনে নেয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

'যে হারে মুখ শুকাচ্ছে,' বনের কিনারে এসে বলল টাকি। 'শিস বেরোবে নাকি খোদাই জানে!'

শিস দেয়ার চেষ্টা করল সে। শব্দ বেরোল বটে, তবে সেটাকে শিস মনে হলো না। যেন কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ ভূতের নিঃশ্বাস।

তবে সেটাই যথেষ্ট। মুহূর্তে কান খাড়া করে ফেলল এডিক। লেজ হয়ে গেল বন্দুকের নল।

আরও জোরে শিস দেয়ার চেষ্টা করল টাকি। পারল না।

গলার কাছে ঝাঁকুনি খেতে শুরু করেছে এডিকের। ধীরে ধীরে চাপা স্বর বেরিয়ে এল। বাড়তে লাগল সেটা। ঠোঁট উঠে গেল ওপরে। বেরিয়ে পড়ল দাঁত।

'টাকি, থামো থামো!' তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম ওকে। 'এখনই সব নষ্ট করে দিও না।'

শিস থামাল টাকি।

ঢিল হয়ে এল কুকুরটার স্নায়ু।

'গাম-টাম কিছু আছে কারও কাছে? গলাটা শুকিয়ে গেছে আমার।'

এক টুকরো গাম বের করে দিল টাকিকে কডি।

'একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম,' ক্যাপ বলল, 'এডিক আমাদের ডোবাবে না।'

গাছের পাতার ছায়া নাচছে মাটিতে। ফাঁক-ফোকর দিয়ে চুইয়ে নামছে সূর্যালোক। ওদের পায়ের চাপে মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো ডাল ভাঙছে।

'আয়, এডিক,' শিকল ধরে টান দিল আবার টাকি। 'আরে আয় না!'

'আস্তে!' সাবধান করল কডি। 'শুনে ফেলবে তো।'

'আয়, এডিক!' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে ডাকল আবার টাকি।

বড় বেশি ঝামেলা করছে কুকুরটা। বার বার থেমে যাচ্ছে শোঁকার জন্যে। শিকল টেনে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। ওর পছন্দের প্রচুর গন্ধ রয়েছে বোধহয় বনের মধ্যে। সারাক্ষণ লেজ দোলাচ্ছে। হিঁক-হিঁক হিঁক-হিঁক করে দম নিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন হাঁপাচ্ছে।

গভীর বনে ঢুকে পড়েছি আমরা এখন। এগিয়ে চলেছি খাঁড়ির দিকে। ছায়া বাড়ছে, বাড়ছে ঠাণ্ডা। আলো এখানে বেগুনী।

'ওরা এল কিনা, চট করে গিয়ে দেখে আসছি আমি,' ফিসফিস করে বললাম। হাতের বাদামী ব্যাগটা তুলে দিলাম ক্যাপের হাতে। 'ধরো। আমি যাব আর আসব।'

সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে ব্যাগটা দেখতে লাগল ক্যাপ। 'কি আছে এর মধ্যে?'

'দেখতেই পাবে,' বলে আর দাঁড়ালাম না। লম্বা ঘাস মাড়িয়ে দ্রুতপায়ে এগোলাম ট্রী-হাউসটার দিকে।

কডিরা কি করছে দেখার জন্যে ফিরে তাকালাম একবার। এডিককে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মাটিতে বসে পড়ে বড়সড় একটা শুকনো ডালের মাথা চিবাচ্ছে কুকুরটা।

ঘাস থেকে সরে এসে সরু একটা কাঁচা রাস্তা ধরে এগোলাম। পায়ে চলা পথ। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। আজকে আমাদের জেতার দিন।

ট্রী-হাউসটা রয়েছে এক টুকরো ঘাসে ঢাকা খোলা জায়গার অন্য প্রান্তে গাছের ওপর। খাঁড়িটা আরও সামনে। পানির স্রোতের মিষ্টি কুল্‌কুল্ শব্দ কানে আসছে।

গাছের আড়ালে থেকে যতটা সম্ভব নিজেদের আড়াল করে এগোলাম। যাতে ওরা দেখে না ফেলে। তাহলে এত কষ্ট করে আসাটাই মাটি হবে।

কুত্তাটাকে দেখে মুসার মুখের অবস্থা কি হবে, কল্পনা করে আবারও হাসি পেল আমার।

ঘাসবনের কিনারে এসে দাঁড়ালাম। পিটার আর তার বন্ধুরা এখানে শূটিং করে গেছে। মাটিতে পায়ের ছাপ নিশ্চয় পড়েছে। ঘাসের জন্যে দেখা যাচ্ছে না।

গাছের আড়ালে থেকেই খোলা জায়গাটার কিনার ধরে এগোলাম। ট্রী-হাউসটা নজরে এল। অনেক বড় একটা কাঠের বাক্সের মত লাগছে। বুড়ো ওক গাছের নিচের ডালে বসানো হয়েছে। তবে মাটি থেকে যথেষ্ট ওপরে। দড়ির সিঁড়ি লাগিয়েছে বেয়ে ওঠার জন্যে।

কিন্তু ওরা কোথায়? মুসা, রবিন কিংবা কিশোর?

একজনকেও তো চোখে পড়ছে না।

লম্বা ঝোপ ঠেলে আরও কয়েক পা এগোলাম। কাঁধে কাঁটার খোঁচা লাগল। 'উহ্' করে শব্দটা আপনাআপনি বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, ঠেকাতে পারলাম না।

হাঁটা বন্ধ করলাম না। তবে সাবধান রইলাম, কোন কারণে আর যাতে কোন শব্দ করে না ফেলি।

কানে এল কথার শব্দ।

দেখতে পেলাম ওদেরকে। তিনজনেই আছে। আমার আগে আগে হেঁটে

যাচ্ছে। বনের মধ্যে।

চট করে ঢুকে পড়লাম একটা ঘন ঝোপে।

আমার মাত্র কয়েক ফুট সামনে রয়েছে ওরা। দেখে ফেলল নাকি?

না। দেখেনি।

উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে। কোন কিছু নিয়ে তর্ক বাধিয়েছে তিন বিচ্ছু। পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছি।

উল্টো দিকে চলে গেল ওরা। মাঝে মাঝেই হাত বাড়িয়ে ফুল ছিঁড়ছে কালটুটা, কিংবা নিচু হয়ে ঘাসের ডগা ছিঁড়ছে। অস্থির আচরণ।

দারুণ হয়েছে! চমৎকার! ভাবলাম আমি।

আমি জানি আজকে আমাদেরই দিন।

নিঃশব্দে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে চললাম আবার। বন্ধুদের জানানোর জন্যে তর সইছে না।

যেখানে রেখে গিয়েছিলাম, ঠিক সেখানেই পেলাম ওদেরকে। 'এডিক, এবার তোর পরীক্ষা হবে!' উত্তেজিত কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

'ওরা আছে সত্যি?' বিশ্বাস করতে পারছে না ক্যাপ।

'আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

'গুড!' কডি বলল।

এডিকের শিকল ধরে টান দিল টাকি। টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

'দাঁড়াও, এক মিনিট,' থামিয়ে দিলাম ওকে। ক্যাপের হাত থেকে নিয়ে নিলাম ব্যাগটা। 'জিনিসটা আগে লাগিয়ে দিই।'

ব্যাগ থেকে শেভিং ক্রীমের একটা ক্যান বের করলাম।

'এটা কিজন্যে?' বুঝতে পারছে না ক্যাপ।

'কুত্তাটার মুখে লাগিয়ে দেব। বুঝলে না? দেখে যাতে মনে হয় ফেনা গড়াচ্ছে। পাগলা কুত্তা। জলাতঙ্ক হলে কুকুরের মুখ দিয়ে সব সময় ফেনা পড়তে থাকে। যখন দেখবে একটা দৈত্যের মত পাগলা কুত্তা তাড়া করেছে, কি করবে? স্রেফ চোখ উল্টে দেবে।' হা-হা করে হাসলাম আনন্দে।

আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে আমার বুদ্ধির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল কডি।

খুশি হলাম। আমার ধারণা, প্রশংসায় সব মানুষই খুশি হয়।

এতক্ষণ উঠতে চায়নি, কিন্তু আমি ক্রীম মাখাতে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এডিক। টাকিকে টেনে নিয়ে ছুটল খোলা জায়গাটার দিকে।

'ঠিক আছে, যাক,' শিকলে টান রেখে টাকি বলল। 'ওদের একেবারে কাছে গিয়ে ক্রীম মাখিয়ে ছেড়ে দেব।'

কডি, ক্যাপ আর আমি ওদের পেছন পেছন চললাম।

খোলা জায়গাটায় উঁচু, ঘন একটা ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। ঢুকে পড়লাম ভেতরে। এখানে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।

খোলা জায়গাতেই আছে বিচ্ছুগুলো। লম্বা ঘাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি নিয়ে যেন আলোচনা করছে। অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই।

ওদের কণ্ঠস্বর কানে আসছে। কিন্তু দূর থেকে কথাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে না। পানি বয়ে যাওয়ার শব্দও শুনতে পাচ্ছি।

'এডিক, তোর যাওয়ার সময় হয়েছে,' ফিসফিস করে বলল টাকি। ঝুঁকে বসল গলা থেকে শিকলটা খুলে দেয়ার জন্যে। আমাদের বলল, 'ও খোলা জায়গায় বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে শিস দেয়া শুরু করব। টেরি, রেডি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যানটা তুলে ধরলাম। এডিক মুখ ফেরাল আমার দিকে। খানিকটা ঘন ফেনা স্প্রে করে নিলাম নিজের হাতে।

হঠাৎ কানে এল পদশব্দ। আমাদের পেছন থেকে।

পড়ে থাকা ডালপাতার ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে কোন প্রাণী। ঝোপের মধ্যে উঁকি দিল একটা কাঠবিড়ালী।

এডিকও দেখে ফেলেছে ওটাকে। কুকুরটার মুখে ফেনা মাখানোর জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছি, এমন সময় লাফ মারল সে।

সরে না গেলে আমার গায়ের ওপরই পড়ত। তাড়াহুড়ো করে সরতে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেলাম।

চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম কাঠবিড়ালীটাকে তাড়া করেছে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আমার তিন বন্ধু। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছে সবাই।

চিৎকার করে উঠল টাকি, 'এডিক! এডিক! জলদি আয়!'

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। হাতে সাবান। শার্টের বুকের কাছটায় সাবান লেগে গেছে। ফিরেও তাকালাম না। সোজা দৌড় দিলাম বনের দিকে, ওদের পেছন পেছন।

অনেক সামনে চলে গেছে ওরা। দেখতে পাচ্ছি না। টাকির গলা কানে আসছে। এডিকের নাম ধরে ডেকে চলেছে একনাগাড়ে।

দশ

প্রাণপণে দৌড়ে ধরে ফেললাম ওদের।

'এডিক কোথায়? এডিক?' জিজ্ঞেস করলাম হাঁপাতে হাঁপাতে।

'ওদিকেই কোনখানে হবে,' সামনে ঘন গাছপালা দেখিয়ে বলল টাকি।

'উঁহু, আমার মনে হচ্ছে ওদিকে ডাক শুনলাম,' উল্টো দিকে দেখাল ক্যাপ।

'ধরা দরকার,' হাঁপানোর যন্ত্রণায় কথা বলতে পারছি না ঠিকমত। 'এখন হারালে ওকে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'এমন যে দৌড়াতে পারে, জানতামই না। আর কত চমক লুকিয়ে রেখেছে এডিক, কে জানে! এতদিনেও ওকে পুরোপুরি চিনতে পারলাম না,' টাকি বলল। 'কাঠবিড়ালী ধরার জন্যে পাগল হয়ে গেছে।'

'এত গাধা কেন?' কডি বলল। 'ও জানে না, ওকে একটা কাজ দেয়া হয়েছে?'

'আসলে···আমারই ভুল হয়ে গেছে···এত আগে শিকলটা খোলা উচিত হয়নি,' গুঙিয়ে উঠল টাকি। 'এখন আর কোনমতেই ধরতে পারব না শয়তানটাকে।'

'পারব পারব,' মুখে বললাম বটে, কিন্তু মনে মনে দমে গেছি। 'ও নিজে নিজেই চলে আসবে। কাঠবিড়ালীটাকে ধরতে তো পারবে না জানা কথা। তখন ঠিকই ফেরত আসবে।'

পড়ে যখন গিয়েছিলাম তখন শার্টে লাগা সাবানের ফেনায় কুটো-পাতা আটকে গিয়েছিল। সেগুলো সরাতে গিয়ে লেগে গেল হাতের ময়লা। শার্টের ওই জায়গাটাতে বিশ্রী দাগ হয়ে গেল।

কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। এডিককে খুঁজছে আমার চোখ।

'খাঁড়ির কাছে চলে গেল নাকি?' নাকের ওপর চশমাটা ঠিক করে বসাল কডি।

মাথায় একটা কুটো লেগে আছে তার। টোকা দিয়ে ফেলে দিলাম। বললাম, 'অতিরিক্ত কথা বলছি আমরা। কাজের চেয়ে কথা বেশি। কুকুরটাকে খুঁজে বের করা দরকার। ওদেরকে ভয় দেখানোর সম্ভাবনাটা এখনও হয়তো শেষ হয়ে যায়নি।'

হতাশার কথা ভাবতে কোন সময়েই ভাল লাগে না আমার।

'চলো, এডিককে খুঁজি,' দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেছে টাকির মুখ। 'বনের অভিজ্ঞতা নেই ওর, একেবারে নতুন। যদি কিছু ঘটে যায়...' কেঁদে ফেলবে যেন সে।

ভাগাভাগি হয়ে খুঁজতে চললাম। আমি ধরলাম খাঁড়ির দিকের রাস্তাটা। নিচু নিচু গাছের ডাল দু'হাতে সরাতে সরাতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে প্রায় দৌড়ে চললাম। এডিকের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম যতটা সম্ভব চাপা স্বরে।

হাঁদার বাদশা কুত্তাটা কি সর্বনাশটাই না করল! কি করে করতে পারল এ রকম একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ?

কাঁটাঝোপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আবার কাঁটার খোঁচা খেয়ে আঁউক করে উঠলাম। আঁচড় লেগে কেটে গেছে বেশ খানিকটা। কাটাটা দেখার জন্যে থামলাম। রক্ত বেরিয়ে গেছে।

গুরুত্ব না দিয়ে আবার এডিকের খোঁজে বেরোলাম।

এতক্ষণে খাঁড়ির কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা আমার। কিন্তু পানির শব্দ কানে আসছে না।

সঠিক পথে আছি তো? না ভুল করলাম?

দৌড়াতে শুরু করলাম। সামনে মরা গাছ কিংবা বড় শিকড় পড়লে লাফ দিয়ে দিয়ে ডিঙোতে লাগলাম। দুই হাতে ঠেলে সরাতে লাগলাম লম্বা নলখাগড়া। মাটি অতিরিক্ত নরম। শ্যাওলায় ছাওয়া। জুতো ডেবে যায়।

খোলা জায়গাটা কি সামনে?

তার পরেই তো রয়েছে খাঁড়িটা।

থেমে গেলাম। হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগলাম।

দম নিয়ে যখন সোজা হলাম, চারপাশে ভালমত তাকিয়ে বুঝতে পারলাম সত্যি পথ ভুল করেছি।

সূর্য দেখার চেষ্টা করলাম। দিক ঠিক করে নিতে পারব। কিন্তু দেখা গেল না। গাছপালা এত ঘন, রোদই ঢোকে খুব সামান্য।

'হারিয়ে গেছি,' জোরে জোরে নিজেকেই শোনালাম। ভয় পাওয়ার চেয়ে

অবাক হয়েছি বেশি। বিশ্বাস হচ্ছে না। বনে পথ হারিয়েছি! মাডি ক্রীকের বনে!

ঘুরে দাঁড়ালাম। চেনা কোন চিহ্ন চোখে পড়ে কিনা দেখতে লাগলাম। পেছনে ছাই রঙের গাছের সারি ঘন বেড়া তৈরি করেছে। বাকি তিন দিকে অপেক্ষাকৃত কালো রঙের গাছ ঘিরে রেখেছে।

'এই, কেউ শুনতে পাচ্ছ?' চিৎকার করে ডাকলাম। কেঁপে উঠল গলা। ভয় পেতে শুরু করেছি।

'শুনছ? শুনতে পাচ্ছ?' আরও জোরে চেঁচিয়ে ডাক দিলাম।

জবাবে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল একটা পাখি। ডানার শব্দ তুলে উড়ে চলে গেল।

কডি, টাকি, ক্যাপের নাম ধরে ডাকলাম কয়েকবার।

জবাব নেই।

ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। 'আই, শুনছ তোমরা? আমি হারিয়ে গেছি! পথ খুঁজে পাচ্ছি না!'

মট্ করে শুকনো ডাল ভাঙল। বাঁয়ে। পরক্ষণে কানে এল ভারী পায়ের শব্দ।

'এই, কে? কে?' চিৎকার করে ডেকে উঠে কান পাতলাম।

জবাব এল না। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে থাকল।

ঘন গাছপালার ভেতরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছি।

আরেকটা পাখি ডাকল। ডানার শব্দ।

ভারী পায়ের শব্দ। মাটিতে পড়ে থাকা সরু ডাল ভাঙল পায়ের চাপে।

'এডিক? তুই?'

কুকুরটাই হবে। মানুষ হলে সাড়া দিত।

তাকিয়ে রইলাম। কুকুরটার বেরোনোর অপেক্ষায়।

'এডিক?'

না! এডিক নয়! অন্য আরেকটা কুকুর!

লাল লাল চোখ। ভয়াবহ চেহারা। বিশাল। ছোটখাট একটা ঘোড়ার সমান! মিশমিশে কালো মসৃণ চামড়া। চকচকে মাথাটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে গর্জে উঠল। জ্বলন্ত চোখ মেলে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

'দেখ্ বাবা, লক্ষ্মী ছেলে! অমন করে না! তুই তো লক্ষ্মী!'

কিন্তু যতই টেনে টেনে আদুরে কণ্ঠে লক্ষ্মী বলি না কেন, সে আর শোনে না। আচমকা দাঁত বের করে বিকট শব্দে ঘাউ ঘাউ করে উঠল। রক্ত পানি করা গর্জন।

লাফ দিল পরমুহূর্তে। আমার গলা কামড়ে ধরতে আসছে।

এগারো

'ই কুত্তা, হাই!' আমার পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল কেউ।

মাঝপথে শূন্যে ঝুলে গেল যেন গর্জন করতে থাকা কুকুরটা।

জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে এখনও চোখজোড়া। চার পায়ের ওপর ঝপ্ করে নামল।

'হাইক! যা, যা!' আবার শোনা গেল চিৎকার।

ঘুরে তাকালাম। দৌড়ে আসছে ক্যাপ। হাতে একটা লাঠি। ওটা নেড়ে চিৎকার করতে থাকল, 'যা যা! যা, কুত্তা!'

মাথা বাড়িয়ে দিয়ে গর্জন করে উঠল আবার কুত্তাটা। চোখের দৃষ্টি আমার ওপর স্থির। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক পা পিছিয়ে গেল। দুই মোটা উরুর মাঝখানে লেজ গুটিয়ে নিল। আরেক পা পিছাল। আরও এক পা।

'যা, ভাগ!' সাহস পেয়ে ধমকে উঠলাম। 'গেলি!'

বুঝতে পারলাম না কেন–আমরা দু'জন বলে, নাকি ক্যাপের হাতের লাঠিটার জন্যে–হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে এক লাফে গিয়ে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দৈত্যটা।

'উফ্, বাঁচলাম!' গুঙিয়ে উঠলাম আমি। 'গেছিলাম আজকে! বাপরে বাপ!' এতক্ষণে খেয়াল হলো বুক ব্যথা করছে, অনেকক্ষণ ধরে নিঃশ্বাস আটকে রেখেছি। ফোঁস করে ছাড়লাম।

'ঠিক আছ তো তুমি?' ক্যাপ জিজ্ঞেস করল।

'আছি! আছি!' বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল কণ্ঠ। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।'

কুকুরটা যেদিকে গেছে সেদিকে তাকাল ক্যাপ। 'ও কি কুত্তা, না ঘোড়ারে বাবা! আসল কুকুর না ওটা, বুঝলে। শয়তান! শয়তান! নরক থেকে উঠে এসেছে!'

মাথা ঝাঁকালাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। আমি জানি, ভয়ানক ওই জানোয়ারটাকে আবার দেখতে পাব। দুঃস্বপ্নে।

'এডিককে পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নাহ্,' পড়ে থাকা একটা মরা গাছে রাগ করে লাথি মারতে গিয়ে নিজের পায়েই ব্যথা পেল ক্যাপ। সামলে নিয়ে বলল, 'এখনও পায়নি। ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ছে এখন টাকি...'

'হুঁ...বুঝতে পারছি ওর মনের অবস্থা,' বিড়বিড় করে বলতে গিয়ে চোখ পড়ল আবার গাছের গোড়ার একটা ঝোপের দিকে। কি যেন নড়ছে মনে হলো। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। আবার বেরোচ্ছে নাকি দৈত্যটা!

না। বাতাসে নড়েছে। দমকা বাতাস মরা পাতা ঝরাল বেশ কিছু।

'চলো, যাই,' ব্যথা পাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে মরা গাছটায় আবার এক লাথি হাঁকাল ক্যাপ। মুখ কুঁচকে ফেলল ব্যথায়।

রাস্তা ধরে এগোলাম দু'জনে। লম্বা বাঁক নিয়ে রাস্তাটা আবার সোজা হয়ে নেমে গেছে ঢালু হয়ে। আশেপাশে ঝোপের মধ্যে ছোটখাট প্রাণীর আনাগোনা টের পাচ্ছি।

তাকালাম না। আমার মন এখন অন্যখানে। এখনও কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি ভয়াবহ কুকুরটাকে।

একটু পরেই দেখা হয়ে গেল টাকি আর কডির সঙ্গে। দু'জনেরই বিধ্বস্ত চেহারা।

'কি করব এখন?' আমাকে দেখেই পুতুল হারানো বাচ্চার মত ককিয়ে উঠল টাকি। দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কেঁদে

ফেলবে। 'এডিককে না নিয়ে বাড়ি যেতে পারব না আমি! মা আমাকে আস্ত রাখবে না!'

'আচ্ছা, টাকি,' কডি বলে উঠল, 'তোমার কুকুরটা বাড়ি ফিরে যায়নি তো? এ কথাটা তো ভাবিইনি। নিশ্চয় বাড়ি ফিরে গেছে হাঁদাটা।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল টাকির মুখ। 'তাই তো, এটা তো ভাবিনি! তুমি বলতে চাইছ বনের মধ্যে হারিয়ে যায়নি সে?'

'না, কুত্তা কুত্তাই,' ভরসা দিলাম আমি, 'ওরা হারায় না। অভিজ্ঞতা না থাকলেও না। মানুষ হারায়।'

'ও ঠিকই বলেছে,' ক্যাপও বলল। 'দিক নির্ণয়ে কখনও ভুল করে না কুকুর। আমি শিওর, এডিক বাড়ি ফিরে গেছে।'

'চলো, বাড়ি গিয়ে দেখা যাক ও ফিরেছে কিনা,' টাকির কাঁধে সহানুভূতির হাত রাখল কডি।

'গিয়ে যদি দেখি নেই?' করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল টাকি, 'তখন কি হবে?'

'তাহলে আর কি? পুলিশকে ফোন করে জানাতে হবে। ওদের বলতে হবে কুকুরটাকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে।'

হ্যাঁ, এ বুদ্ধিটা পছন্দ হলো টাকির।

মুখ কালো করে বন থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে সবে রাস্তায় উঠেছি, মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম তিন গোয়েন্দাকে। ওদের সঙ্গে দুটো কুকুর।

মুসার একপাশে দাঁড়ানো এডিক। অন্য কুকুরটা সেই কালো দানবটা, বসে আছে তার পায়ের কাছে।

দৌড় দিলাম।

'হাই!' কাছে পৌঁছতে হাসিমুখে স্বাগত জানাল কিশোর, 'এগুলো কি তোমাদের কুকুর?'

মরা মাছের মত হাঁ হয়ে গেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

মুসার হাত চেটে দিচ্ছে এডিক। গোলাম হয়ে গেছে ওর। কালো দৈত্যটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মুসার জন্যে কিছু করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে জীবন।

'সেইন্ট বার্নার্ডটা আমার,' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল টাকি।

'শিকল পরিয়ে রাখা উচিত ছিল,' উপদেশ দিল কিশোর। 'বনের মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। মনে হচ্ছিল, বন চেনে না, হারিয়ে গেছে। নাম কি ওর?'

'এডিক।'

'এডিক, যা, তোর মনিবের কাছে যা,' আদেশ দিল মুসা।

ওর মুখের দিকে তাকাল কুকুরটা। মনে হলো ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। তবু গেল। টাকির কাছে যাবার আগে আরেকবার ফিরে তাকাল মুসার দিকে।

কিশোরকে ধন্যবাদ দিল টাকি।

'এই কুকুরটার মালিককে এখন খুঁজে বের করতে হবে,' কালোটাকে দেখিয়ে বলল কিশোর। 'মনে হচ্ছে আজ বনের মধ্যে কুকুর হারানোর ধুম পড়েছে।' নিচু হয়ে কালো কুকুরটার মাথা চাপড়ে দিতে দিতে বলল, 'কেউ দাবি করতে না এলেই খুশি হতাম।' মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দারুণ কুকুর, তাই না?'

বুঝলাম, কখন হাল ছেড়ে দিতে হয়।

অসম্ভব! ওদেরকে ভয় দেখানো আমার কর্ম নয়। বুদ্ধিতে তো কুলাবেই না। ভাগ্যটাও আমার প্রতি বিরূপ। কিছুই করতে হচ্ছে না ওদের। ঠকাতে গিয়ে নিজে নিজেই ঘোল খেয়ে যাচ্ছি আমরা।

পরাজয়টা মেনে নেয়াই ভাল, নিজেকে বোঝালাম।

বারো

বড়ার হাতের মত বরফ-শীতল একটা হাত কাঁধ চেপে ধরল আমার।

চিৎকার করে উঠলাম।

হেসে উঠল টাকি। 'টেরি, তোমার হলোটা কি?'

'এত ঠাণ্ডা কেন তোমার হাত!' হাতটা সরিয়ে দিয়ে কাঁধটা ডলতে ডলতে বললাম।

'বরফ ধরেছি। ফ্রিজ থেকে বের করে কোকের গ্লাসে দিয়েছি,' টাকি জানাল।

সবাই হেসে উঠল আমার দিকে তাকিয়ে।

কুকুর নিয়ে বনে যাওয়ার দিন কয়েক পর টাকিদের বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছি আমরা। কি করা যায় আলোচনা করছি। সেদিন বৃহস্পতিবার। রাত সাড়ে আটটা। বাড়িতে যার যার বাবা-মাকে বলে এসেছি একসঙ্গে অঙ্ক করতে যাচ্ছি আমরা।

'বাদ দেয়া উচিত এ সব,' হতাশ কণ্ঠে বললাম। 'ওদেরকে ভয় দেখাতে পারব না আমরা। আমাদের সাধ্যের বাইরে। কিছু কিছু মানুষ আছে, সব সময় নাগালের বাইরে থেকে যায়। হাজার চেষ্টা করেও পারা যায় না ওদের সঙ্গে।'

'টেরি ঠিকই বলেছে,' ক্যাপ বলল। বাদামী কাউচটায় কডির পাশে বসেছে সে। মুখোমুখি একটা বড় আর্মচেয়ারে বসেছি আমি।

টাকি বসেছে পুরানো সাদা রঙের কার্পেটটায়। 'এত সহজেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন?' বলল সে। 'উপায় একটা নিশ্চয় আছে। কিশোররা রোবট নয়। ভয় পায় না, হতেই পারে না। কোন্ জিনিসটাকে ভয় পায়, সেটা কেবল জানতে হবে আমাদের।'

'কি জানি!' মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম। 'আদৌ কোন কিছুকে ভয় পায় কিনা, সেটাই তো সন্দেহ হচ্ছে আমার এখন।'

ঘরে ঢুকল এডিক। রোমশ লেজটা প্রায় টানতে টানতে গিয়ে দাঁড়াল টাকির কাছে। ওর হাত চাটতে শুরু করল।

রাগে আগুন ধরে গেল মাথায়। চিৎকার করে উঠলাম, 'বের করো বেঈমানটাকে! দেখলেই গা জ্বলে এখন!'

মুখ তুলে বিষণ্ন বড় বড় বাদামী চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল এডিক। করুণ চাহনি।

'কি বলেছি তোকে শুনিসনি, এডিক?' কঠিন কণ্ঠে বললাম। 'তুই একটা বেঈমান।'

'ও একটা সাধারণ কুকুর,' সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করল টাকি, 'মানুষের মত কি আর বুদ্ধি আছে ওর?' কুকুরটাকে টেনে নিজের পাশে বসাল সে।

'কুত্তাগুলোও ওই কালটুটাকে পছন্দ করে,' কডি বলল।

'বোলতা, সাপ, মাকড়সা–কে করে না?' তিক্তকণ্ঠে বললাম। 'কোন কিছুকে ভয় পায় না ও। কিচ্ছুকে না।'

হঠাৎ কুটিল ভঙ্গি ফুটল কডির মুখে। কোন ফন্দি বের করতে পারলে এ রকম হয় ওর। 'সত্যিকারের ভয় পাওয়ানোর জিনিস নেই বলছ?' হাত বাড়িয়ে ক্যাপের মাথা থেকে একটানে ক্যাপটা খুলে নিতে গেল সে।

থাবা মারল ক্যাপ। 'খবরদার! ভাল হবে না বলছি!' কিন্তু আটকাতে পারল না।

টুপিটা এখন কডির হাতে।

এই প্রথম ক্যাপের চুল ভালমত দেখলাম। মাথায় লেপ্টে আছে কালো চুল। চুল সহ মাথাটাকে মনে হচ্ছে খোদাই করা কাঠ। কপালে লাল একটা গোল দাগ হয়ে আছে। সব সময় টুপিটা চেপে বসে থাকে বলে।

'আই, কি করলে!' রাগে চিৎকার করে উঠল সে। কডির হাত থেকে ক্যাপটা কেড়ে নিয়ে মাথায় বসিয়ে দিল আবার।

'চুল ধোও না নাকি তুমি কখনও?' টাকি জিজ্ঞেস করল।

'ধুলে কি হবে?' আয়নার কাছে হেঁটে গেল ক্যাপ। যাতে দেখে ভালমত বসাতে পারে টুপিটা।

আরও খানিকক্ষণ মুসাকে ভয় দেখানো নিয়ে পরামর্শ করলাম আমরা। কিন্তু কাজ হতে পারে, এ রকম কোন কিছুই ভেবে বার করতে পারলাম না। নিরাশ হয়ে 'গুড নাইট' জানিয়ে দরজার দিকে রওনা হলাম।

রাত ন'টার সামান্য পরে ফোন করে বাবা বলল বাড়ি যেতে। বন্ধুদের 'গুড নাইট' জানিয়ে দরজার দিকে এগোলাম।

সারাটা দিনই বৃষ্টি হয়েছে। থেকে থেকেই নেমেছে ঝুপ্ ঝুপ্ করে। এত পানি জমে গেছে, রাস্তার আলোয় টাকিদের লনটাতে মনে হলো বন্যা হয়ে গেছে।

একই রাস্তায় চার ব্লক দূরে আমাদের বাড়ি। সাইকেলটা নিয়ে আসা উচিত ছিল। হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। বিশেষ করে রাতের বেলা বৃষ্টিভেজা পথে একা হাঁটতে কি কারও ভাল লাগে। রাস্তার কয়েকটা ল্যাম্প পোস্টের আলো নিভে আছে। গা ছমছমে পরিবেশ।

অন্ধকারকে ভয় পাই। কালটুটা পায় না। ভাবতেই মেজাজটা গেল আরও খারাপ হয়ে। কাঁধে ঠাণ্ডা হাত পড়লে হৃৎপিণ্ড লাফ মারে। ধুর! আমি একটা ইয়ে!

হাতের কথাটা মনে পড়তেই নতুন একটা বুদ্ধি এল মাথায়। তাই তো! ঠাণ্ডা হাতের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

একটা খালি জায়গা পেরোচ্ছি। জায়গাটা আয়তাকার। প্রচুর আগাছা আর ছোট ছোট ঝোপ জন্মে আছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম মাটিতে কি যেন নড়ছে।

ধূসর মাটির পটভূমিতে কালো একটা ছায়া।

লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে কিছু একটা দৌড়ে আসছে আমার দিকে।

ঢোক গিললাম। গলার ভেতরটা শুকনো। হঠাৎ দৌড়ানো শুরু করলাম।

ছায়াটা পিছলে চলে আসছে আমার দিকে।

চাপা একটা গোঙানি কানে এল।

বাতাসের শব্দ?

মনে হলো অশরীরী কিছুর।

আরেকটা গোঙানি। এবার আরও বেশি স্পষ্ট।

আশেপাশের সমস্ত গাছপালা যেন ফিসফাস শুরু করে দিল। কালো কালো ছায়া দ্রুত ছুটে আসছে আমার দিকে।

দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। রাস্তা পার হয়ে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু ছায়াগুলো ছাড়ল না আমাকে। আসছেই। ঘন কালো হয়ে যাচ্ছে যেন আরও। বুঝতে পারছি, আমার মুক্তি নেই।

বাড়ি ফিরে যেতে পারব না আর কোনদিন।

তেরো

প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি। এরচেয়ে জোরে আর আমার পক্ষে ছোটা সম্ভব না। এখন মনে হচ্ছে গাছপালা, ঝোপঝাড় সব কিছুই কালো ছায়া হয়ে উড়ে আসছে আমার দিকে। নীরব রাস্তায় থপ্-থপ্ থপ্-থপ্ জুতোর শব্দ হচ্ছে আমার।

কপালের শিরায় চাপ দিতে আরম্ভ করেছে রক্ত। আমাদের বাড়িটা চোখে পড়ছে। গাড়ি-বারান্দার হলুদ আলোয় চকচক করছে বাড়ির সামনে লনের ঘাসগুলো।

এসে গেছি। চলে এসেছি। আর সামান্য একটু। খোদা! ওইটুকু! মাত্র ওইটুকু পথ পার করে দাও!

কয়েক সেকেন্ড পর হুড়মুড় করে ঢুকলাম গাড়ি-বারান্দায়। থামলাম না। গতিও কমালাম না। বাড়ির পাশ দিয়ে সোজা ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়লাম রান্নাঘরে। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে তালা আটকে দিলাম।

দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছে ফুসফুসটা। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। গলার ভেতরটা সিরিষ কাগজের মত খসখসে। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যতক্ষণ না ঠিকমত দম নিতে পারলাম।

বুঝতে পারলাম, কেউ আমাকে অনুসরণ করেনি। সব আমার ভীত মগজের কল্পনা।

এ ধরনের ঘটনা আমার বেলায় আরও ঘটেছে।

অনেক বার।

এত ভীতু কেন আমি? নিরাপদ জায়গায় এসে নিজেকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেলাম।

বুকের দুরুদুরু কমে আসছে। পুরোপুরি শান্ত হতে আরও সময় লাগবে। তবে পেয়ে গেছি উপায়টা!

'টেরি, ফিরেছিস?' বসার ঘর থেকে বাবা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি হল পেরিয়ে লিভিং রূমে ঢুকলাম। সোজা এগোলাম দোতলার সিঁড়ির দিকে। 'একটা ফোন করে আসি।'

'এই তো এলি···'

জবাব না দিয়ে উঠতে শুরু করলাম সিঁড়ি বেয়ে। অর্ধেক ওঠার পর নিচে তাকিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'বাবা, মাত্র একটা ফোন। চলে আসছি।'

প্রায় উড়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকলাম। টাকিকে ফোন করলাম। দ্বিতীয়বার বাজার আগেই ফোন তুলে নিল সে। 'হালো?'

'শুরু থেকেই ভুল করে যাচ্ছি আমরা,' কোন রকম ভূমিকা না করে বললাম।

'টেরি? তুমি বাড়িতে! উড়ে গেলে নাকি?'

'শুরু থেকেই ভুল করে যাচ্ছি আমরা, বুঝলে?' একই কথা আবার বললাম। 'ওদের ভয় দেখানোর চেষ্টাটা করতে হবে রাতের বেলা। কখনই দিনে নয়। রাতে সব কিছুকেই ভয় লাগে।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। নিশ্চয় আমার কথাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে টাকি। অবশেষে জবাব দিল সে, 'তুমি ঠিকই বলেছ, টেরি। রাতে সব কিছুকেই ভয় লাগে। কিন্তু রাতে যে চেষ্টা করা হয়নি, তা তো নয়। লাশ রাখার ঘরে, এত এত কফিনের মধ্যে নিয়ে গিয়েও তো কিছু করা গেল না ওদের। এরচেয়ে ভয়ঙ্কর আর কি আছে?'

'নিশ্চয় আছে। ভাবিনি এখনও। ভাবলেই বেরিয়ে যাবে।'

'দেখো, বেরোয় নাকি। বেরোলে তো ভাল।'

মজার ব্যাপারটা হলো, আমাদের আর ভাবতে হলো না। পরদিন সকালে কিশোরই উপায়টা বাতলে দিল। একেবারে মাথায় ঢুকিয়ে দিল আমার।

চোদ্দ

সকালের মীটিঙে দৈত্য-দানব নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা।

রোজ সকালেই ক্লাস শুরুর আগে আমাদের মীটিং বসে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ক্লাস রূমে বসেই। মিস্টার হোমার চক-বোর্ডটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, কিংবা তিন পাওয়ালা একটা টুলে বসে আমাদের সভাপতিত্ব করেন।

আলোচনাটা চালায় মূলত তিন-চারজন ছেলেমেয়ে। বাকি সবাই আমরা কেবল নীরব শ্রোতা।

ওই তিন-চারজনের মধ্যে এক নম্বরে হলো কিশোর পাশা। সারাক্ষণ নানা রকম বুদ্ধি বেরোতে থাকে তার মাথা থেকে। কোন বিষয়েই আলোচনা করতে ভয় পায় না সে, মন্তব্য করতে পিছপা হয় না।

সেদিনের বিষয়বস্তু ছিল: দৈত্য-দানব। মিস্টার হোমার একটা লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিলেন ওগুলোর ওপর। বললেন, 'মানুষের দৈত্য বানানোর প্রয়োজন ছিল। কারণ মানুষ ভয় পেতে ভালবাসে। ভয়ের কারণ সৃষ্টি করে নেয় নিজে নিজেই। যে সব দানবের কল্পনা আমরা করি, সেগুলোর অস্তিত্ব কোনকালে ছিল

না, এখনও নেই।'

একটানা লেকচার দিতে থাকলেন তিনি। তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে বটে সবাই, কিন্তু আমার মনে হয় না কথায় কান আছে কারও। এত সকালে এ সব কচকচি কারই বা ভাল লাগে।

'দেশে দেশে অসংখ্য গল্প-গাথা, রূপকথা, কিংবদন্তী, গুজব চালু আছে ওদের নিয়ে,' মিস্টার হোমার বলছেন। 'কিন্তু একজন মানুষও কোনদিন প্রমাণ করতে পারেনি দৈত্য-দানবের অস্তিত্ব। এর মানেটাই হলো, ওগুলো বাস করে শুধু আমাদের মনে, আমাদের কল্পনায়…'

'কথাটা মোটেও ঠিক নয়, স্যার,' বাধা দিয়ে বলে উঠল কিশোর। মতের মিল না হলে কখনও চুপ করে থাকে না সে। মিস্টার হোমার কেন, প্রিন্সিপ্যাল স্যারের সঙ্গে হলেও না।

চকচকে কপালে ভাঁজ পড়ল মিস্টার হোমারের। ঝোপের মত ভুরুজোড়া কাছাকাছি হলো। 'তোমার কাছে কোন প্রমাণ আছে?'

'ও নিজেই তো একটা দানব,' ফিসফিস করে বলে উঠল আমার পেছনে বসা একটা ছেলে। 'কোন কিছুতেই ওকে টলানো যায় না।'

জানালার চৌকাঠে বসেছি আমি। জানালা দিয়ে পিঠে এসে পড়া সকালের রোদটা বেশ আরাম লাগছে। কডি বসেছে আমার পাশে। ব্রেইসে আটকে যাওয়া গাম খোলার চেষ্টা করছে।

'আমার এক চাচা আছেন, বিজ্ঞানী,' কিশোর বলল। 'তিনি আমাকে বলেছেন, স্কটল্যান্ডের লক নেস মনস্টার নাকি সত্যি আছে। মস্ত একটা লেকে বাস করে ওটা। দেখতে প্রাগৈতিহাসিক জলচর ডাইনোসরের মত। ওটার ছবিও তুলেছে অনেকে।'

'ওসব ছবি কোন প্রমাণ নয়…' বলতে গেলেন মিস্টার হোমার।

কিন্তু কিশোর থামল না। যা বলার সেটা শেষ না করে সহজে থামে না সে। 'চাচা বলেন, বিগফুটও নাকি আছে। হিমালয় পর্বতে তোলা বিগফুটের পায়ের ছাপের ছবি দেখেছেন নিজের চোখে।'

ফিসফাস মন্তব্য শুরু হয়ে গেল ঘরের চারপাশে। ক্যাপের দিকে তাকালাম। সবার মাঝখানে ঘরের মেঝেতে বসে আছে। আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল।

'এত সব দানবের কাহিনী শুধু কল্পনা করে তৈরি করা যায় না,' বলে যাচ্ছে কিশোর। কারও কথাতেই কান নেই ওর। কোন মন্তব্যের তোয়াক্কা করছে না। 'ওগুলো বাস্তব। সত্যি আছে ওরা। কিছু কিছু মানুষ স্বীকার করতে ভয় পায়, লোকে বাঁকা চোখে তাকাবে, হাসাহাসি করবে ভেবে।'

'তোমার কথায় কিন্তু যুক্তি আছে,' গলা চুলকাতে লাগলেন মিস্টার হোমার। পাল্টা যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না বোধহয়। 'এই, তোমরা কি সবাই কিশোরের কথায় একমত? দৈত্য-দানব বিশ্বাস করো কারা কারা, দেখি হাত তোলো তো।'

অনেকেই হাত তুলল। কতজন শুনে দেখিনি, দেখার অবস্থাও নেই তখন আমার। নিজের চিন্তায় হারিয়ে গেছি। তবে মুসা যে তুলেছে সেটা লক্ষ করলাম। রবিন তোলেনি। দ্বিধা করছে। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। পাগল হয়ে গেছে কিনা ভাবছে বোধহয়।

কিশোর দৈত্য-দানবে বিশ্বাস করে! সত্যি করে? অবিশ্বাস্য লাগল আমার কাছে। শুধু তর্কের খাতিরে মিস্টার হোমারকে হারানোর জন্যেই এ ভাবে যুক্তি দেখায়নি তো? তবে মুসা যে করে, তার চেহারা দেখেই নিশ্চিত হয়ে বলে দেয়া যায়।

নাহ্, মনে হয় না। ও যে ভাবে বলল কথাগুলো, বিশ্বাস করে বলেই পারল।

দানব···দানব···

রাতের বেলা দানব। অন্ধকারে···

মনে মনে কিশোরকে ধন্যবাদ দিলাম আমি। বুদ্ধিটা একেবারে সোনার থালায় করে আমার হাতে তুলে দেয়ার জন্যে। চমৎকার বুদ্ধি। এরচেয়ে ভাল আর হয় না।

পনেরো

পিটারকে বললাম আমাকে সাহায্য করতে। সে রাজি হলো না। ক্যাপ, কডি আর টাকিকে ধরে আনলাম তাকে অনুরোধ করার জন্যে।

'তোমাদের ইচ্ছে,' ভ্রূকুটি করল পিটার, 'কাদার দানবের পোশাক পরে বনের মধ্যে গোটা তিনেক ছেলেকে ভয় দেখাতে হবে আমাদের।'

'তিনটে হোক বা না হোক,' অধৈর্য হয়ে বললাম, 'অন্তত একটাকে পাওয়াতেই হবে। মুসা আমান। তাহলেই আমরা খুশি।'

'ঠিক, ভয় পাওয়াটা ওর পাওনা হয়ে গেছে,' দ্রুত আমার সঙ্গে সুর মেলাল টাকি। 'সত্যি বলছি। দোষটা ওরই।'

শনিবার বিকেল। আমাদের পেছনের আঙিনায় কথা বলছি। বাগানে কাজ করছে পিটার। হাতে হোস পাইপ। শনিবারে বাগানের অনেক কাজ করতে হয় তাকে। লন পরিষ্কার করতে হয়। ফুল গাছে পানি দিতে হয়।

'আমাদের ছবিটা শেষ হয়ে গেছে।' পাইপের মুখটা ঠিক করতে করতে বলল পিটার, 'বাঁচলাম। ওই জঘন্য পোশাক পরে, সারা গায়ে কাদা মেখে আর শূটিঙে যেতে হবে না আমাকে।' আমাদেরকে এড়ানোর জন্যে বলল সে।

'প্লীজ!' কাতর কণ্ঠে অনুনয় করলাম।

'মজা পাবেন এতে,' পিটারকে বলল ক্যাপ। 'সত্যি বলছি। খুব মজা পাবেন। যদি না পান, তখন বলবেন।'

চাবি ঘুরিয়ে দিল পিটার। কিন্তু পানি বেরোল না।

'পাইপে প্যাঁচ খেয়ে গেছে,' হাত তুলে দেখালাম। 'দাঁড়াও, খুলে দিচ্ছি।' নিচু হয়ে জট ছাড়াতে শুরু করলাম।

'মাডি ক্রীকে গাছের ওপর একটা বাসা বানিয়েছে কিশোররা–কিশোর, মুসা আর রবিন,' পিটারকে বলল টাকি। 'নাম দিয়েছে ট্রী-হাউস। ওখানে বসে জন্তু-জানোয়ার দেখে।'

'জানি আমি,' জবাব দিল পিটার। 'ওই জায়গাটাতেই তো শূটিং করেছি। ট্রী-হাউসটাকেও কাজে লাগিয়েছি। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওখানে উঠে গেছে কাদার

দানব, একজন মানুষকে খুন করার জন্যে। দারুণ হয়েছে দৃশ্যটা।'

'তাই নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী হয়ে উঠল কডি। 'দেখাবেন এখন? শুধু ওই জায়গাটুকু।'

'প্লীজ!' আবার অনুরোধ করলাম। কতবার যে 'প্লীজ' বলেছি কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। বুদ্ধিটা মাথায় আসার পর থেকেই অনুরোধ করে চলেছি পিটারকে।

'তারমানে, তোমরা চাইছ রাতের বেলা দানবের পোশাক পরে বনের মধ্যে ওখানে লুকিয়ে থাকি আমরা?' পিটার জিজ্ঞেস করল।

পাইপের জট খুলে ফেললাম। পিচকারির মত সজোরে গিয়ে পানির ধারা আঘাত হানল ক্যাপের টুপিতে। অল্পের জন্যে খুলে পড়ল না টুপিটা। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলাতে। চিৎকার দিয়ে সরে গেল সে।

হাসতে লাগলাম আমরা।

'সরি,' বলে পাইপের মুখটা ফুল গাছের দিকে সরিয়ে নিল পিটার। 'ইচ্ছে করে করিনি।'

'না না, সে তো দেখতেই পেলাম,' ক্যাপ বলল। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' আমি বললাম পিটারকে, 'তুমি আর তোমার বন্ধুরা গিয়ে লুকিয়ে থাকবে বনের মধ্যে। রাতের বেলা, অন্ধকারে। কিশোররা গেলেই বেরিয়ে এসে পিলে চমকে দেবে ওদের।'

'তারমানে গায়ে উদ্ভট পোশাক, সারা গা থেকে কাদা ঝরছে; বিচিত্র, ভয়াবহ সব শব্দ করতে করতে তাড়া করে যেতে হবে ওদের?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করতে হবে,' বুঝতে পারছি ধীরে ধীরে আগ্রহী হয়ে উঠছে পিটার।

'রাতের বেলা ওদেরকে ট্রী-হাউসের কাছে নেবে কি করে?'

ভাল প্রশ্ন। এ কথাটা তো ভাবিনি!

'আমি নিয়ে যাব,' বলে উঠল কডি। কেন যেন সারা বিকেল ধরে বেশ চুপচাপ ছিল সে।

'আবার তুমি কিশোরের কণ্ঠস্বর নকল করতে যাবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম। 'তাতে কোন কাজ হবে না।'

'উঁহু, কিশোর সাজতে যাব না আর এবার,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল কডি। 'তবে আমি ওদের ঠিকই নিয়ে যাব ওখানে।'

হোসটা উঁচু করে ধরল পিটার। অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে পানির ধারা। ওভাবেই ধরে রেখে আমার দিকে পেছন করে দাঁড়াল সে। ওর মনে কি ভাবনা চলছে বুঝতে পারছি না।

'পিটার? করবে তো?' আবার অনুনয় শুরু করলাম। ফকিরের ভিক্ষে চাওয়ার মত। 'করবে সাহায্য আমাদের?'

'তাতে আমার লাভটা কি?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'অ্যাঁ···' দ্রুত চিন্তা করে নিলাম। 'এক হপ্তার জন্যে তোমার চাকর হয়ে যাব, যাও। বাগানের সব কাজ করে দেব, তুমি যা যা করো। লনের ঘাস কাটা, আগাছা সাফ করা, ফুল গাছে পানি দেয়া···সব। রাতে বাসন-পেয়ালাগুলোও ধুয়ে দেব, যে কাজগুলো তোমার ভাগে আছে। এমনকি তোমার ঘরটাও পরিষ্কার করে দেব।'

ঘুরে দাঁড়াল সে। চোখের পাতা সরু করে তাকাল। 'সত্যি তো?'

'সত্যি,' সুযোগটা কোনমতেই হাতছাড়া করতে চাইলাম না। 'পুরোপুরি তোমার চাকর হয়ে যাব। পুরো হপ্তার জন্যে। সাতদিন।'

চাবি ঘুরিয়ে দিল সে। কয়েকবার ফুচ-ফুচ করে পানির ধারা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে লাগল। 'এক মাস হলে কেমন হয়?'

বলে কি! এক মাস! পুরো একটা মাস ধরে পিটারের আদেশ শোনা, ধমক-ধামক সহ্য করা···

অতটা খেসারত? কালটুটাকে একটুক্ষণের জন্যে ভয় পাওয়ানোর বিনিময়ে একটা মাস পিটারের···

কিন্তু আমি তখন মরিয়া।

অত হিসেব-নিকেশের মধ্যে গেলাম না। রাজি হয়ে গেলাম, 'ঠিক আছে, এক মাস।'

হাসল পিটার। আমার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। ভেজা হাত।

হোসটা আমার হাতে তুলে দিল। 'ধরো, চাকর,' আদেশের সুরে বলল সে।

পাইপটা নিয়ে নিলাম ওর হাত থেকে। ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে ভিজে যেতে লাগল আমার জিনসের প্যান্ট।

'তিনজন যাব আমরা,' পিটার বলল। 'তিনটে কাদার দানব। কখন যেতে বলো?'

'কাল রাতে,' জবাব দিলাম আমি।

ষোলো

মাডি ক্রীকের কাদার দানবের গুজব বা কিংবদন্তী যা-ই হোক, ভাল জানি না আমি। ছোটবেলায় একটা ছেলের মুখে যেটুকু শুনেছি। ছেলেটা আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করত। সফলও হয়েছিল।

কিংবদন্তীটা এ রকম:

আমাদের শহরের কিছু আদি বাসিন্দা, প্রথম প্রথম যারা বসতি স্থাপন করতে এসেছিল তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল খুবই গরীব। বাড়ি বানানোর টাকা ছিল না তাদের। তাই বনের মধ্যে মাডি ক্রীকের ধারে ছোট কুঁড়ে বানিয়ে বাস করতে গেল ওরা।

খাঁড়িটা তখন অনেক চওড়া ছিল, গভীরও ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি। এখন যেমন সরু একটা জলের ধারা বয়ে যায়, তখন এমন ছিল না।

মানুষগুলো ছিল গরীব, কঠোর পরিশ্রমী। কাদা দিয়ে কুঁড়ে বানাল ওরা। খাঁড়ির পাড়ে পুরো একটা গ্রাম তৈরি করে ফেলল। শহরে যারা থাকত, তারা দেখতে পারত না ওদের। কোন সাহায্য তো করলই না, একঘরে করে রাখার বন্দোবস্ত করল।

শহর কর্তৃপক্ষ সাপ্লাইয়ের পানি দিল না। দোকানদারেরা খাবার আর অন্যান্য জিনিস বিক্রি করতে চাইল না।

ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল মাডি ক্রীকের বাসিন্দারা। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু মন গলল না শহরবাসীর।

এ সব ঘটনা একশো বছর আগেকার। কিংবা তারও আগের।

এক রাতে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হলো। মুষলধারে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে হারিক্যানের তীব্রতা নিয়ে ঝড়।

মাডি ক্রীকের লোকেরা নিরাপদ জায়গায় সরে যাবারও সুযোগ পেল না। তার আগেই ফুলে ফেঁপে উঠল খাঁড়ির জল। বন্যা হয়ে গেল। প্রবল স্রোত।

বন্যার পানির সঙ্গে মিশে উঠে এসেছিল খাঁড়ির তলার কাদা। গলগলে সেই কালো কাদা ঢেকে দিল পুরো গ্রাম। তলিয়ে গেল মানুষ-জন, বাড়িঘর। আগ্নেয়গিরির লাভার মত সব কিছু ঢেকে দিয়েছিল সেই অবিশ্বাস্য কাদা।

পরদিন সকালে গ্রামের কোন কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। খাঁড়ির পানিতে আশেপাশের বহুদূর পর্যন্ত সয়লাব। ঢেউ খেলছে। বনটা একেবারে নীরব। প্রাণীশূন্য।

গ্রাম নেই, মানুষ নেই।

কিছুই নেই।

কিংবদন্তী বলে, বছরে একবার কোন এক পূর্ণিমার রাতে কাদার নিচ থেকে উঠে আসে বহুকাল আগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রামবাসীরা। অপঘাতে মারা যাওয়ায় ওরা এখন দানব হয়ে গেছে। অর্ধমৃত, অর্ধজীবন্ত। এখন ওরা পঙ্কদানব।

বছরে একবার কাদায় রচিত কবর থেকে বেরিয়ে আসে ওরা। চাঁদনী রাতে বিমল জ্যোৎস্নায় প্রাণ ভরে নাচানাচি করে। শহরবাসীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে, যারা ওদেরকে ওই দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

আমি যতদূর জানি, এই।

এ সব রূপকথা যদিও এখন আর বিশ্বাস করি না, তবে গল্পটা ভয়ঙ্কর। বছরের পর বছর ধরে রকি বীচের মানুষের মুখে মুখে চলে এসেছে এই গল্প।

ছোট ছেলেমেয়েরা এখনও শুনে ভয় পায়।

সেই গল্পের ওপর ভিত্তি করেই রোববার রাতে পিটার আর তার দুই বন্ধু যাবে কালটু মুসাকে ভয় দেখাতে, যাকে কোনমতেই পরাস্ত করতে পারিনি আমরা।

সতেরো

রোববার। সাতটা বেজে গেছে। পিটার বাথরুমে। পোশাক পরা শেষ। শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে মেকআপ ঠিক আছে কিনা। মুখে, চুলে পুরু করে মেখেছে কালচে-ধূসর কাদা। ঢোলা কালো জিনসের প্যান্টের ওপর একটা ঢলঢলে কালো শার্ট পরেছে। সব কিছুতেই কাদা। নরম, তরল কাদা ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা।

দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিলাম। আয়নার দিকে তাকিয়ে আরেক তাল কাদা তুলে মাথায় ফেলল পিটার। সন্তুষ্ট হতে পারছে না।

'জঘন্য লাগছে তোমাকে,' মুখ বাঁকিয়ে বললাম।

'এটাই তো চাই,' জবাব দিল পিটার। 'বাসন-পেয়ালাগুলো ধোয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' মেজাজ খারাপ করে জবাব দিলাম। নিজেরগুলো ধুতেই ইচ্ছে করে না, অন্যের নোংরা ঘাঁটতে কি আর ভাল লাগে।

'আমার ময়লা কাপড়-চোপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'বার বার শুধু হ্যাঁ-হ্যাঁ করছ কেন?' ধমকে উঠল পিটার। 'সম্মান দেখিয়ে বলো, হ্যাঁ, স্যার। আমি এখন তোমার মনিব, ভুলে যাচ্ছ কেন। চাকরের মত আচরণ করো।'

'হ্যাঁ, স্যার,' খুন করতে ইচ্ছে হলো পিটারকে। কিন্তু চেপে গেলাম। চাকর হওয়ার পর থেকেই যথেষ্ট খাটাচ্ছে আমাকে সে। যত খুশি দুর্ব্যবহার করছে। ইচ্ছে করে অতিরিক্ত কাজ বের করে করে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে।

তবে খাটুনির ফসল পেতে যাচ্ছি। এসে যাচ্ছে আসল সময়। যে আনন্দটুকু পাওয়ার জন্যে পুরো একটা মাস চাকর খেটে দিতে হবে আমাকে।

আমার দিকে ঘুরল পিটার। 'কেমন দেখাচ্ছে?'

'কাদার স্তূপ।'

হাসল সে। 'থ্যাংকস।'

ওকে অনুসরণ করে সামনের হলে গিয়ে ঢুকলাম। ছোট টেবিল থেকে গাড়ির চাবিটা তুলে নিল সে। 'আমার দুই বন্ধুকে তুলে নিতে যাচ্ছি।' হলের আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষবারের মত দেখে নিল কোথাও কোন খুঁত আছে কিনা। 'ওদের নিয়ে বনে যাব। লুকিয়ে থাকব। যাবে এখন আমার সঙ্গে?'

মাথা নাড়লাম। 'না, ধন্যবাদ।'

'আবারও শুধু না!' কর্কশ কণ্ঠে বলল পিটার। 'বলো, না, স্যার।'

এখন ওকে রাগানো চলবে না। বললাম, 'না, স্যার। আমি আগে কডিদের বাড়ি যাব। একটা জরুরী কাজ সারতে হবে আগে।'

'কাজটা কি?'

'মুসাকে বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, স্যার।'

'গুড, এ ভাবেই স্যার স্যার বলবে!'

মনে মনে বললাম, 'হ্যাঁ, বলব! দাঁড়াও না, কাজটা আগে হয়ে যাক। প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব আমি মনে করেছ!'

আমার মনের কথা পড়তে পেরেই যেন আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল পিটার।

'টেরি, কি হয়েছে? কিসের কথা বলাবলি করছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন কডির বাবা।

কডিদের রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ওর বাবা রেফ্রিজারেটর থেকে কোল্ড ড্রিংক বের করছেন। একটা ক্যান বের করে রেখে খাবারের জন্যে হাত বাড়ালেন তাকগুলোর দিকে। ভেতরের আলো চোখে পড়াতে চোখ কুঁচকে রেখেছেন।

'কিছু না, বাবা,' জবাব দিল কডি। অস্বস্তি বোধ করছে সে। 'এমনি একটু হাওয়া খেতে যাওয়ার কথা বলছি।'

রেফ্রিজারেটরের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। 'তার চেয়ে এসো বরং

তাস খেলি। এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না আমার।'

'না না, আজ না,' মানা করে দিল কডি। 'আজ রাতে না, বাবা, প্লীজ!'

রান্নাঘরের ঘড়িটার দিকে তাকালাম। দেরি হয়ে যাচ্ছে। কডির বাবার সঙ্গে কথা বলারও সময় নেই। মুসাকে বের করে নিয়ে যেতে হবে বনে।

'তাহলে কেরম? তোমরা দু'জন, আমি একা, যাও,' আবার রেফ্রিজারেটরের দিকে ঘুরে গেলেন কডির বাবা। 'পারবে না, চ্যালেঞ্জ করছি আমি। রাত তো মাত্র শুরু...'

'বাবা, জরুরী কথা আছে আমাদের, স্কুলের একটা মীটিঙের ব্যাপারে,' কডি বলল। 'তা ছাড়া...কয়েকজন বন্ধুকে খবর দিতে হবে...'

আহত মনে হলো কডির বাবাকে। জিনিসপত্র বের করে স্যান্ডউইচ বানাতে শুরু করলেন। 'খাবে? তোমাদের খিদে আছে?'

'না,' অধৈর্য ভঙ্গিতে মানা করে দিয়ে আমার হাত ধরে বসার ঘরের দিকে টেনে নিয়ে চলল কডি।

'কডি, তাড়াতাড়ি করা দরকার,' ফিসফিস করে বললাম।

'আমাকে আর বলা লাগবে না,' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল কডি। নাকের ওপর ঠেলে দিল চশমাটা। 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে এই ফোনটা কানে লাগিয়ে রাখো। আমি দোতলারটা দিয়ে কিশোরের সঙ্গে কথা বলছি।'

'কি বলবে ওকে? দয়া করে এবার আর কিশোর সাজতে যেও না,' অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছি আমিও। অনেক আগেই ফোন করার দরকার ছিল। এতটা দেরি করা উচিত হয়নি।

হাসল কডি। 'দেখো এবার কি করি।' আমাকে একটা রহস্যের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে উঠে গেল দোতলায়।

মিনিটখানেক অস্থির ভাবে পায়চারি করলাম। ফোন করার সময় দিলাম কডিকে। তারপর আস্তে করে রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকালাম।

ততক্ষণে ফোন তুলে ফেলেছে কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'আমি। কডি।'

দম আটকে গেল আমার। সত্যি কথাটা বলে দিচ্ছে! আবারও ডোবাবে নাকি?

'ও, কডি! কি ব্যাপার?' কিশোর যে অবাক হয়েছে সেটা ফোনেও তার কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল।

'একটা খবর শুনলাম,' কডি বলল। 'তুমি আগ্রহী হবে। শুনলাম, আজ রাতে পঙ্কদানবেরা উঠে আসবে মাডি ক্রীকের কাদার নিচ থেকে।'

দীর্ঘ নীরবতার পর অবশেষে জবাব এল কিশোরের তরফ থেকে, 'রসিকতা করছ, তাই না?'

'না,' জবাব দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না কডি। 'সত্যি শুনেছি। জানোই তো, প্রতি বছর এ সময়ে পূর্ণিমার রাতে বেরিয়ে আসে ওরা।'

'জানি। কিন্তু আমাকে ফোন করে এ কথা জানানোর মানেটা কি?' কিশোরের কণ্ঠে সন্দেহ।

ওর নাম কিশোর পাশা! এত সহজে ওকে গিলাতে পারবে না কডি। মনে মনে বললাম। আমার আঙুলগুলো রিসিভারে এত চেপে বসেছে, সাদা হয়ে গেছে।

দম ফেলতে ভুলে গেছি।

'কেন আবার?' কডি বলছে। 'তুমিই না স্কুলে দানবের ব্যাপারে এত আগ্রহ দেখালে। তাই দানবগুলোর কথা শুনে প্রথমেই তোমাকে জানানোর কথা মনে এল। ভাবলাম, তুমি দেখতে চাইবে।'

'কার কাছে শুনলে?' সন্দেহ যাচ্ছে না কিশোরের।

'রেডিওতে,' নির্বিকার কণ্ঠে মিথ্যে বলে দিল কডি। 'ওরা বলল, আজ রাতে বনের মধ্যে যখন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়বে, দানবেরা উঠে আসবে কাদার নিচ থেকে।'

'তাই নাকি?' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'তাহলে তুমি চলে যাও। কাল স্কুলে জানিও কি কি দেখলে।'

গেছে! কডির পরিকল্পনা ব্যর্থ। জানতাম কিশোরকে রাজি করাতে পারবে না। পিটার আমাকে খুন করবে।

'আমি তো যাবই,' দমল না কডি। 'আসল দানব দেখার সুযোগ তো আর মেলে না। পেয়েছি যখন, হাতছাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না। তা তুমি ভয় পেলে নাকি?'

'মানে!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কিশোরের কণ্ঠ।

'মানে তো সহজ। দানবে আগ্রহ, অথচ সত্যিকারের দানব দেখার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করতে চাইছ, ভয় পেয়েছ বলেই তো। ঠিক আছে, থাকো ঘরে বসে। কাল জানাব সব।'

'ভয়? আমি?' কণ্ঠস্বর এত খাদে নেমে গেল কিশোরের, শোনাই যায় না প্রায়। 'কাদার দানব কেন, কোন দানবকেই আমি ভয় পাই না, কডি। দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি। তুমি দেখো, ভয় পেয়ে গিয়ে ঘরে বসে থেকো না।'

'না, থাকব না। তবে আগেই বলে দিচ্ছি, যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছে। দানবগুলো উঠে এসে যদি তাড়া করে, কিছু ঘটে, চাপাচাপি করেছে বলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না…'

'তা দেব কেন? আমি যাচ্ছি। মাডি ক্রীকের পাড়ে দেখা হবে।' ফোন রেখে দিল কিশোর।

কয়েক সেকেন্ড পর মুখ ভর্তি চওড়া হাসি নিয়ে নিচে নেমে এল কডি।

'তুমি একটা জিনিয়াস, কডি' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম ওর। 'চলো, জলদি।'

আঠারো

মাডি ক্রীকের কাছে এসে গায়ে কাঁটা দিল আমার। বাতাস ভীষণ ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা। চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে কালো রঙের ছেঁড়া মেঘ। বিশাল গোল চাঁদটাকে মনে হচ্ছে গাছের মাথার কাছে ঝুলে রয়েছে।

'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না,' সামনের অন্ধকার গাছপালার দিকে তাকিয়ে বলল কডি, 'অবশেষে ভয় দেখাতে পারব ওদের।'

'আমিও পারছি না,' বললাম। 'আমি খালি ভাবছি, এবার কোন্ ভজঘটটা হবে!'

'এবার আর কিছু হবে না, দেখো,' আমাকে ভরসা দেয়ার চেষ্টা করল কডি। 'আজকের রাতে আর খালি হাতে ফিরে আসতে হবে না আমাদের।'

বনের কিনারে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে টাকি আর ক্যাপ। আগে দেখল কডি। হাত নাড়ল। দু'জনে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে।

'পিটারদের দেখেছ?' জিজ্ঞেস করলাম। অন্ধকার বনের দিকে তাকিয়ে তিনজনকে খুঁজতে লাগল আমার চোখ।

'না,' ক্যাপ বলল।

'তবে কিশোরদের দেখেছি,' টাকি জানাল। 'তিনজনে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল ট্রী-হাউসের দিকে।'

'সঙ্গে তারমানে কালটুটাকে নিয়ে এসেছে!' উত্তেজনা চাপতে না পেরে চিৎকার করে উঠলাম। 'রবিনকেও! যাক, ভালই হলো। তিনটেই প্যান্ট ভেজাবে আজ।'

'আসবে তো বটেই। ওরা কি আর একা চলে। যেখানে যায়, তিনটে একসঙ্গে।'

'তোমাদের দেখে ফেলেনি তো? তাহলে সন্দেহ করে বসবে...'

'না, এত কাঁচা কাজ কি আর করি,' টাকি বলল। 'ওদের সাড়া পেয়েই গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম।'

কোথায় লুকিয়েছিল দেখাল সে। বড় বড় কিছু গাছ আর ঝোপঝাড় আছে ওখানে।

হঠাৎ করেই অনেক বেশি আলোকিত হয়ে গেল বনটা। মুখ তুলে দেখলাম, চাঁদের গা থেকে মেঘ সরে গেছে। ফ্যাকাসে হলুদ আলো যেন ভেসে ভেসে নেমে আসছে বনতলে, ভূতুড়ে আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে।

আচমকা গাছের ডালপালাগুলোকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বয়ে গেল দমকা বাতাস। ফিসফাস কানাকানি শুরু হয়ে গেল আমাদের চারপাশে। যেন হঠাৎ করে সরব হয়ে উঠেছে ভূতেরা।

'খাঁড়ির কাছে লুকিয়ে আছে হয়তো পিটাররা,' আন্দাজ করলাম। 'চলো। আসল দৃশ্যটা দেখার লোভ কোন কিছুর বিনিময়েই ছাড়তে রাজি নই আমি।'

গাছপালার ফাঁক দিয়ে এগিয়ে চললাম চারজনে। নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। বনতলে এত বেশি ডাল-পাতা আর কুটো-কাঁটা পড়ে আছে, জুতোর নিচে পড়লেই শব্দ হয়ে যাচ্ছে। নীরবতার মাঝে মনে হচ্ছে বোম ফাটার শব্দ।

মৃদু একটা গোঙানি কানে আসতেই থমকে গেলাম।

ভূতুড়ে, বিষণ্ন বিলাপের মত কান্না।

দাঁড়িয়ে গেছি। আবার শোনা গেল গোঙানি।

'কি-কি-ক্কিসে কাঁদছে?' তোতলানোর জ্বালায় কথা আটকে যেতে চাইল আমার।

'কোন পাখিটাখি হবে,' টাকি বলল। 'কত রকমের নিশাচর পাখির কথা শুনেছি। আফ্রিকার জঙ্গলে এক ধরনের পাখি নাকি আছে, এ ভাবে ডেকে ডেকে

ভয় দেখিয়ে মানুষকে দিশেহারা করে ফেলে। ছুটতে ছুটতে অজ্ঞান হয়ে যখন পড়ে যায় মানুষটা, ঠুকরে ঠুকরে তার খুলি ফুটো করে মগজ খায়। চোখের প্রতিও নাকি বেজায় লোভ ওসব পাখির···'

'থাক থাক, আর বোলো না!' তাড়াতাড়ি মানা করলাম।

আরেকটা গোঙানি। গাছের ওপর থেকেই আসছে। সন্দেহ নেই। পাখিই হবে। আমেরিকায় কি মগজখেকো পাখি আছে?

'কি হলো, টেরি?' আমার পিঠে চটাস্ করে থাপ্পড় মারল ক্যাপ। 'এখনই ভয় পাওয়া শুরু করে দিলে? সবাই তো একসঙ্গেই আছি। একটা পাখি কিছু করতে পারবে না।'

'না, তা পারবে না।' সামান্য একটা পাখির ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছি ভেবে নিজের ওপরই রাগ হলো। মনে মনে গালাগাল করতে লাগলাম নিজেকে। ধমক দিয়ে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। ভাগ্যিস এখন রাতের বেলা। আমার ভীত চেহারাটা দেখতে পায়নি ওরা।

হাত বাড়িয়ে দুষ্টুমি করে ক্যাপের টুপিটা ঘুরিয়ে দিলাম। মনটাকে অন্য দিকে ফেরাতে চাইছি।

'আরে, কি করছ!' রাগে চিৎকার করে উঠে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ।

'চুপ! আস্তে! কিশোররা শুনে ফেলবে!' ধমক দিল কডি।

দ্রুত ট্রী-হাউসের দিকে এগিয়ে চললাম। বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফিসফাস করেই চলেছে গাছগুলো। গায়ে গা ঠেকিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। কেউ আর কথা বলছি না।

আরও গোঙানি শুনতে পেলাম। বিলাপের মত কান্না। হতচ্ছাড়া পাখিগুলো এত ডাকে কেন? কি পাখি? এত রাগ হলো, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম–দিনের বেলা এয়ারগান নিয়ে এসে বংশ সাফ করে দিয়ে যাব ওগুলোর। যাতে রাতে আর কোনদিন জ্বালাতে না পারে।

পাখির ডাকের দিকে আর কান দিলাম না।

মনে হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হেঁটে যাচ্ছি। কিন্তু পথ আর ফুরোয় না। আসলে তো হেঁটেছি মাত্র দুই মিনিট। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার। হাঁটু কাঁপছে। এটা উত্তেজনার কারণে, নিজেকে প্রবোধ দিলাম।

'আঁউক!' করে এক চিৎকার দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। শিকড়-টিকড় কিংবা পাথরে হোঁচট খেয়েছি। ভাগ্যিস নাক-মুখ ঠুকে যায়নি।

ক্যাপ আর টাকি মিলে টেনে তুলল আমাকে।

কানের কাছে ফিসফিস করল টাকি, 'ব্যথা পেয়েছ?'

'না!' গলাটা কাঁপছে। রাগ করে হাত দিয়ে থাবা মেরে কাপড় থেকে কুটো ঝাড়তে লাগলাম। কনুইটা লেগেছিল শক্ত কিছুতে। ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছে। জোরে হাত নাড়ানোয় এখন টনটনে ব্যথাও শুরু হলো। তারমানে হাড্ডিতে লেগেছে।

'ওদের আর কি দেখাবে,' টাকি বলল। 'ভয় তো আমাদেরই দেখানো শুরু করলে! হয়েছে কি আজ তোমার, টেরি?'

'না, কিছু হয়নি।'

কনুই ডলতে ডলতে ওদের সঙ্গে সঙ্গে এগোলাম আবার।

খোলা জায়গাটার কিনারে এসে দাঁড়ালাম। গাছের আড়ালের অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে মুখ তুলে তাকালাম ট্রী-হাউসটার দিকে।

ঘরের চেয়ে বাক্সের সঙ্গে মিল বেশি। তবে এখন বাক্সটাও নেই। বেড়া, চালা সব সরিয়ে দিয়ে শুধু নিচের মাচাটা রেখেছে। যাতে চারপাশে তাকিয়ে খুব ভালমত দেখতে পারে। তিনজনকেই দেখা গেল ওখানে। বসে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে।

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের। কিশোরের হাতে একটা দূরবীন। চোখে লাগিয়ে দেখছে। মুসার হাতে টর্চ। মাঝে মাঝে আলো ফেলছে অন্ধকারের দিকে। রবিনের গলায় ঝোলানো ক্যামেরা।

দারুণ! দারুণ! মনে মনে না হেসে আর পারলাম না। সত্যি বিশ্বাস করেছে ওরা। একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে সে-জন্যে। সঙ্গে করে ওঅর্কশীট নিয়ে আসেনি তো? যা দেখবে টুকে নেয়ার জন্যে?

গাছের গোড়ায় লম্বা ঘাসের ওপর আরাম করে বসে মাচার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। নিচু স্বরে মাঝে মাঝে কথা বলছে ওরা। নীরবতার মাঝে শব্দ ভেসে এলেও কথা বোঝা যাচ্ছে না।

'আমার আর সহ্য হচ্ছে না!' ক্যাপ বলে উঠল। 'আসে না কেন?' ক্যাপের বারান্দার নিচে তার উত্তেজিত জ্বলজ্বলে চোখের মণি দুটো দেখতে পাচ্ছি। পাগলের মত গাম চিবিয়ে চলেছে। 'কাউকেই তো দেখছি না।'

খোলা জায়গাটা গিয়ে শেষ হয়েছে খাঁড়ির পাড়ে। তার নিচে আবার কিছু গাছপালা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে জবাব দিলাম, 'পাচ্ছি না তো আমিও। তবে আছে কোন সন্দেহ নেই। আমার সামনেই দানব সাজল, আমার সামনেই বেরিয়ে গেল। চেয়ে থাকো। সময় হলেই বেরিয়ে আসবে।'

'এবং শুরু হবে সীমাহীন আনন্দ,' হাসতে হাসতে জবাব দিল ক্যাপ।

'হ্যাঁ। এত আনন্দ, যা আগে কখনও পাইনি।'

কিন্তু সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে আমার মনে। ভারী হচ্ছে সেটা।

পিটার কোথায়? তার বন্ধুরা?

কোথায় ওরা?

ঠিক এই সময়, ট্রী-হাউসের পেছনে, খোলা জায়গাটার কিনারে নড়ে উঠল কিছু।

উনিশ

চুপ করে ক্যাপের হাত চেপে ধরলাম। হাত তুলে দেখালাম, 'ওই দেখো!' আমার দেখানোর প্রয়োজন ছিল না। সে নিজেই দেখেছে। বাকি দু'জনও দেখেছে।

অন্য দিকে তাকিয়ে আছে কিশোররা। পেছনে কি কাণ্ড ঘটছে দেখতে পায়নি এখনও।

দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছি।

কালো একটা ছায়াকে এগিয়ে যেতে দেখলাম ট্রী-হাউসের কাছে।

তার পেছনে আরেকটা ছায়া। কাদা থেকে টেনে তুলছে নিজেকে। উঠে দাঁড়াল।

তৃতীয় আরেকটা ছায়ামূর্তি উঠে টলতে টলতে এগোল প্রথম দু'জনের পেছনে।

তিনটে পঙ্কদানব!

পিটার আর তার বন্ধুরা সত্যি সত্যি এসেছে। এতক্ষণ ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল কাদার মধ্যে।

এখনও দেখেনি তিন গোয়েন্দা। মোটা একটা ডালে হেলান দিয়ে আছে কিশোর। চোখে দূরবীন।

টর্চ জ্বালল মুসা। দানবগুলোর উল্টো দিকে আলো ফেলল।

পিটার আর তার বন্ধুদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই পরিবেশে সত্যি সত্যি দানব মনে হচ্ছে ওদেরকে।

সারা গায়ে কাদা।

নিশিতে পাওয়া মানুষের মত একঘেয়ে ভঙ্গিতে টলতে টলতে এগোচ্ছে ওরা। দুই হাত সামনে বাড়ানো।

কাছে। আরও কাছে। চলে যাচ্ছে ট্রী-হাউসের আরও কাছে।

ঘোরো! কালটু! ঘোরো! তাকাও এদিকে! মনে মনে দোয়া চাইতে লাগলাম।

ঘুরে তাকাও! চিৎকার করে চাঁদি উড়িয়ে দাও! মগজটা ফুচুৎ করে ছিটকে বেরিয়ে যাক সেই ফুটো দিয়ে! আমার পরাণটা তাতে ঠাণ্ডা হোক!

কিন্তু তবু ঘুরল না ওরা। কিম্ভূত তিনটা দানবকে দেখতে পেল না।

ঘুরে কডিদের দিকে তাকালাম। পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে সে আর টাকি। মুখ হাঁ। চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দারুণ মজা পাচ্ছে এই নাটক দেখে। চোখ মিটমিট করছে ক্যাপ। হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। চূড়ান্ত দৃশ্যের অপেক্ষায় আছে।

আবার দানবগুলোর দিকে ফিরতে গেলাম।

খস্‌খস্ শব্দ হলো পেছনে।

মট্ করে গাছের ডাল ভাঙল। জুতো মচ্‌মচ্ করল।

কে এল?

দেখে তো হতবাক।

আরও তিনটে পঙ্কদানব এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পেছনে।

অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। মুখ চেপে ধরেও থামাতে পারলাম না

আমার তিন বন্ধুও হাঁ।

এগিয়ে আসছে নতুন দানবেরা।

পিটারকে চিনতে পারলাম।

'পি-পি-প্লিটার!'

'সরি! দেরি করে ফেললাম,' পিটার বলল। 'চাকা ফেঁসে গিয়েছিল আমাদের।'

বিশ

'শি দেরি হয়ে যায়নি তো?' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল পিটার।

জবাব দিলাম না। দিতে পারলাম না। কথা সরছে না।

ফিরে তাকালাম খোলা জায়গাটার দিকে। টলতে টলতে গিয়ে ট্রী-হাউসটার নিচে দাঁড়িয়েছে আসল দানব তিনটে। ফিরে তাকাল একটা। মুখ ভর্তি কাদার মাঝখানে চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল চোখের মণি। বুঝতে পারছি, কিংবদন্তীটা সত্যি! আসলেই আছে দানব! কিশোরের কথা ঠিক।

দেখলাম কাদা থেকে ঝটকা দিয়ে দিয়ে নতুন নতুন হাত উঠে যাচ্ছে ওপরে। টান দিয়ে কাদার আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে নিয়ে মাথা তুলল আরেকটা দানব। তারপর আরেকটা। আরও একটা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে লাগল ওগুলো।

কালো কালো মূর্তিগুলো কাদায় মাখামাখি। টলতে টলতে এগিয়ে চলল আগেরগুলোকে অনুসরণ করে। হাঁটার সময় কাদায় টান লেগে চপাৎ চপাৎ শব্দ হচ্ছে।

ডজনখানেকের কম হবে না। কয়েকটা সারি দিয়ে এগিয়ে চলল ট্রী-হাউসের দিকে। বাকিগুলো ঘুরে গেল আমাদের দিকে। এগোবে কিনা ভাবছে নাকি?

'পালাও!' বলে চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'কিশোর! মুসা! জলদি পালাও!' ওরা না তাকালে, ওদের ভয় পাওয়া না দেখলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না।

এতক্ষণে ফিরে তাকাল ওরা। দানবগুলোকে দেখতে পেল।

কিশোরের আতঙ্কিত তীক্ষ্ণ চিৎকার গাছের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। মধু বর্ষণ করতে লাগল যেন আমার কানে।

চিৎকার শুরু করল রবিনও।

মুসাই বরং চুপ। হতভম্ব হয়ে গেছে বোধহয়।

চিৎকার করেই চলেছে কিশোর আর রবিন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছি। ভয় যেমন পাচ্ছি, মজাও পাচ্ছি। জীবনে এমন দৃশ্য আর দেখতে পাব না।

এদিকে তাকিয়ে ছিল যে দানবগুলো, ওরা দ্বিধা করল না আর। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে কাদার ওপর দিয়ে ছুটে আসতে শুরু করল। আমাদের ধরার জন্যে।

আরেকটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। বিমূঢ় ভাবটা কেটে গেছে মুসার। 'বাবাগো! ভূত! ভূত! খেয়ে ফেলল গো!' বলে চিৎকার দিয়ে মাচার ওপর থেকে এক লাফ মারল সে। সামনে পড়ল একটা দানব। ধাক্কা মেরে ওটাকে চিত করে ফেলে দিয়ে দৌড় মারল বনের দিকে।

কিশোর আর রবিনও মাচা থেকে ঝপাঝপ্ লাফিয়ে নেমে পড়িমরি করে দৌড় মারল যে যেদিকে পারল।

পেছনে হুড়মুড় শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার বন্ধুরাও দৌড়ানো শুরু

করেছে। পিটার আর তার দুই বন্ধু আগেই হাওয়া।

আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছে সবাই।

আতঙ্কে হাত-পা সিঁটিয়ে আসতে লাগল।

আর দাঁড়ালাম না। দিলাম দৌড়। পাগলের মত ছুটতে লাগলাম বনের ভেতর দিয়ে। হলুদ জ্যোৎস্নায় কালো কালো গাছগুলোকে আরও কালো লাগছে। পঙ্কদানব বেরোনোর উপযুক্ত পরিবেশ। উপযুক্ত সময়।

আর কিছু ভাবছি না আমি। মগজের মধ্যে একটাই শব্দ: পালাও! পালাও! পালাও!

একুশ

তক্ষণ যা বললাম, এটা দুই হপ্তা আগের ঘটনা। দুটো দীর্ঘ হপ্তা। আতঙ্ক, উত্তেজনা, টেনশন সব শেষ। সমস্তই এখন অতীত। কিন্তু আমি আর বাড়ি থেকে বেরোই না। লজ্জায়।

আমার বন্ধুরাও না।

গতকাল আমাকে জিজ্ঞেস করেছে পিটার: পঙ্কদানবের ছবিটার এডিটিং শেষ, দেখব কিনা। বুঝতে পারছি, ভয়ে এখন আমাকে তেল মারছে সে।

বলে দিয়েছি, দেখব না, কোন আগ্রহ নেই।

সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকি। আমার বন্ধুদেরও একই অবস্থা।

কিশোরদের কথা অন্য।

ওরা কি করেছে জানো, বিশেষ করে কিশোর? স্কুলে সবাইকে বলে বেড়িয়েছে, তার ধারণাই ঠিক। বাস্তবে দানব আছে। হলপ করে বলেছে, সে আর দুই বন্ধু নিজের চোখে দানব দেখে এসেছে মাডি ক্রীকের খাঁড়িতে। ছবি তুলে নিয়ে এসেছে। সাক্ষি মেনেছে আমাদেরও।

'দানব নেই,' জোর গলায় বলার সাহস হয়নি। তাহলে বেকায়দায় পড়ব আমরাই। শেষে হয়তো স্বীকারই করতে হবে, কাদা দিয়ে দানব সাজিয়ে ওদের ভয় দেখাতে লোক পাঠিয়েছিলাম আমরা।

ভাবলেই তেতো হয়ে যায় মনটা। আমরা পাঠিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সব গুবলেট করে দিয়ে এসেছে পিটার আর তার দুই হাঁদা দোস্ত। সুযোগের অপেক্ষায় আছি। চ্যালা কাঠ দিয়ে একদিন পিটারের মাথা দু'ফাঁক করে না দিয়েছি তো আর কি বললাম!

কাদা থেকে প্রথমে যেগুলো উঠেছিল, ওগুলোও যে আসল দানব নয়, সাজানো, পরে জেনেছি। রাস্তায় একা পেয়ে সব বলেছে আমাদেরকে বিচ্ছু তিনটে। বলার সময় সে-কি হাসি। কালটুটা তো দাঁড়াতেই পারছিল না হাসির ঠেলায়।

গোড়া থেকেই হাঁদা বানিয়ে এসেছে আমাদের ওরা। স্কুলে মুসার ব্যাগে সাপ রাখতে দেখে ফেলেছিল লালটু। ট্যাটনাটা তখন মিস্টার হোমারের ব্যাগটা লুকিয়ে ফেলে তাঁকে দিয়ে কায়দা করে সাপটা বের করিয়েছে।

বনের মধ্যে কালো কুকুরটা ওরাই লেলিয়ে দিয়েছিল আমার ওপর। কালটুর এক আত্মীয়র কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওটাকে।

আর সব শেষে যেটা করল, সেটার তো তুলনাই হয় না। মীটিঙে আমাদের শোনাল–দানবে বিশ্বাস করে ট্যাটনাটা। জানত, আমরা তার ফাঁদে পা দেবই। ইস্, কি গাধা আমি! ব্যথা না পেলে মাথার সব চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম!

হয়তো জিজ্ঞেস করবে, ওরা তাহলে মাচা থেকে নেমে পালাল কেন?

ওটা ওদের অভিনয় ছিল। আমাদের ভয়টাকে আরও উস্‌কে দেয়ার জন্যে। বিশ্বাস করানোর জন্যে যে, ওগুলো সত্যি সত্যি দানব। আমরা দেখাতে গিয়েছিলাম ভয়, উল্টে আমাদেরই প্যান্ট খারাপ করিয়ে ছাড়ল। একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার।

একটা কথা স্বীকার না করে পারছি না, বুদ্ধির জোরে কোনদিন ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব না। ওরা যে আমাকে 'শুঁটকি' ডাকে, কমই ডাকে। বরং ডাকা উচিত ছিল: তালঢ্যাঙা মাথামোটা ভীতুর ডিম শুঁটকি।

-: শেষ

তিন বন্ধু/কিশোর চিলার

টেরির দানো

রকিব হাসান

টেরিয়ার ডয়েলের মনে শান্তি নেই।
কোন ভাবেই পেরে ওঠে না
তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। মরিয়া হয়ে উঠল সে।
নিতেই হবে প্রতিশোধ।
ফাঁদ পাতল মাডি ক্রীকের পিচ্ছিল জঙ্গলে;
চাঁদনি রাতে কাদার নিচ থেকে উঠে
আসে যেখানে পঙ্কদানব।